দুর্গরহস্য

পূর্বখণ্ড

১

ব্যোমকেশের শরীর সারাইবার জন্য সাঁওতাল পরগণার যে শহরে হাওয়া বদলাইতে গিয়াছিলাম, বছর না ঘুরিতেই যে আবার সেখানে যাইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই। এবার কিন্তু স্বাস্থ্যের অন্বেষণে নয়, পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় যে নূতন শিকারের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহারই অন্বেষণে ব্যোমকেশ ও আমি বাহির হইয়াছিলাম।

প্রথমবার যখন এ শহরে যাই, তখন এখানকার অনেকগুলি বাঙালীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু শহরের বাহিরেও যে একটি ধনী বাঙালী পরিবার বাস করেন, তাহা কেহ বলে নাই। এই পরিবারটিকে লইয়া এই বিচিত্র কাহিনী। সুতরাং তাহার কথাই সর্বাগ্রে বলিব। সব কথা অবশ্য একসঙ্গে জানিতে পারি নাই, ছাড়াছাড়া ভাবে কয়েকজনের মুখে শুনিলাম। পাঠকের সুবিধার জন্য আরম্ভেই সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া দিলাম।

শহরের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ জংশন হইতে বিপরীত মুখে প্রায় ছয় মাইল পর্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। রাস্তাটি বহু পুরাতন; বাদশাহী আমলের। বড় বড় চৌকশ পাথর দিয়া আচ্ছাদিত; পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস ও আগাছা জন্মিয়াছে, কিন্তু তবু রাস্তার উপর দিয়া মোটর চালানো যায়। দুই পাশের শিলাকর্কশ বন্ধুরতাকে দ্বিধা ভিন্ন করিয়া পথ এখনও নিজের কঠিন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই পথের সর্পিল গতি যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে পাশাপাশি দুটি ক্ষুদ্র গিরিচূড়া। কালিদাসের বর্ণনা মনে পড়ে, 'মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ।' বেশী উঁচু নয়, কিন্তু দুটি চূড়ার মাঝখানে খাঁজ পড়িয়াছে। উপমা কালিদাসস্য বাদ দিলেও দৃশ্যটি লোভনীয়।

চূড়া দুটি নিরাভরণ নয়। একটির মাথায় প্রাচীন কালের এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ; অন্যটির শীর্ষে আধুনিক কালের চুনকাম করা বাড়ি। বাড়ি এবং দুর্গের মালিক শ্রীরামকিশোর সিংহ সপরিবারে এই স্থানে বাস করেন।

এইখানে প্রাচীন দুর্গ ও তাহার আধুনিক মালিকের কিছু পরিচয় আবশ্যক। নবাব আলিবর্দীর আমলে জানকীরাম নামক জনৈক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি রাজা জানকীরাম খেতাব পাইয়া কিছুকাল সুবা বিহার শাসন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত ধনসম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে তখন ক্রান্তিকাল আরম্ভ হইয়াছে; ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল বাদশাহী ভাঙিয়া পড়িতেছে; দুর্দম মারাঠা বর্গী বারম্বার বাঙলা বিহারে হানা দিয়া চারিদিক ছারখার করিয়া দিতেছে; ইংরেজ বণিক বাণিজ্যের খোলস ছাড়িয়া রাজদণ্ডের দিকে হাত বাড়াইতেছে। দেশজোড়া অশান্তি; রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র কাহারও চিত্তে সুখ নাই। রাজা জানকীরাম কুশাগ্রবুদ্ধি লোক ছিলেন; তিনি এই দুর্গম গিরি-সঙ্কটের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈয়ার করাইয়া তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তি এবং পরিবারবর্গকে এইখানে রাখিলেন।

তারপর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল প্লাবনে অনেক কিছুই ভাসিয়া গেল। কিন্তু জানকীরামের এই নিভৃত দুর্গ নিরাপদে রহিল। তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করিতে লাগিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর আরও একশত বছর কাটিয়া গেল।

কোম্পানীর শাসনে দেশ অনেকটা ঠান্ডা হইয়াছে। জানকীরামের দুর্গে তাঁহার অধস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ বিদ্যমান—রাজারাম ও তৎপুত্র জয়রাম। রাজারাম বয়স্থ ব্যক্তি, পুত্র জয়রাম যুবক। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ ও পারিপার্শ্বিক জমিদারীর আয় হইতে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা চলিতেছে। সঞ্চিত অর্থ এই কয় পুরুষে হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া আরও বাড়িয়াছে। জানকীরামের বংশধরদের স্বভাব ছিল টাকা হাতে আসিলেই তাহা স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া রাখা; এইভাবে রাশি রাশি মোহর আসরফি তৈজস সঞ্চিত হইয়া ছিল। কাহারও কোনও প্রকার বদ্‌খেয়াল ছিল না। এই জঙ্গলের মধ্যে বিলাস-ব্যসনের অবকাশ কোথায়?

হঠাৎ দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন কেবল নগরগুলির মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। দাবানলের মত বনে জঙ্গলেও প্রসারিত হইল।

রাজারাম সংসারের কর্তা, তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। চারিদিকে লুঠতরাজ; কোথাও ইংরেজ দলের সিপাহীরা লুঠ করিতেছে, কোথাও বিদ্রোহী সিপাহীরা লুঠ করিতেছে। রাজারাম খবর পাইলেন একদল সিপাহী এইদিকে আসিতেছে। তিনি সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু সম্পত্তি রক্ষা করিবেন কী উপায়ে? শতবর্ষের পুরাতন দুর্গটি সুশিক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্রধারী শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ নয়। দুর্গের জীর্ণ তোরণদ্বার একটি গোলার আঘাতেই উড়িয়া যাইবে। দুর্গে একটি বড় কামান আছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে উহা মরিচা পড়িয়া অকর্মণ্য হইয়াছে, উহার গোড়ার দিকের লৌহকপাট এমন জাম হইয়া গিয়াছে যে খোলা যায় না। তাছাড়া যে-কয়টি গাদা বন্দুক আছে, তাহার দ্বারা জঙ্গলে হরিণ শিকার বা চোর তাড়ানো চলিতে পারে, লুণ্ঠন-লোলুপ সিপাহীর দলকে ঠেকাইয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব।

রাজারাম উপযুক্ত পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবারস্থ নারী ও শিশুদের স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। দুর্গ হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি সাঁওতাল পল্লী ছিল, স্ত্রী পুত্র-বধূ ও দুই তিনটি নাতি-নাতিনীকে সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গের সমস্ত ভৃত্য ও কর্মচারী সেই সঙ্গে গেল; কেবল পুত্র জয়রাম সহ রাজারাম দুর্গে রহিলেন। বিদায়কালে রাজারাম গৃহিণীর অঞ্চলে কয়েকটি মোহর বাঁধিয়া দিলেন। বেশী মোহর দিতে সাহস হইল না, কি জানি বেশী সোনার লোভে পরিচরেরাই যদি বেইমানি করে। তারপর তাহারা প্রস্থান করিলে পিতাপুত্র মিলিয়া সঞ্চিত সোনা লুকাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিন দিন পরে ফিরিঙ্গী নায়কের অধীনে একদল সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারামের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, সোনা দানা লুকাইয়া রাখিয়া নিজেও পুত্রকে লইয়া দুর্গ হইতে অন্তর্হিত হইবেন; কিন্তু তাঁহারা পলাইতে পারিলেন না। সিপাহীরা অতর্কিতে উপস্থিত হইয়া নির্বিবাদে দুর্গে প্রবেশ করিল।

তারপর দুর্গের মধ্যে কি হইল কেহ জানে না। দুই দিন পরে সিপাহীরা চলিয়া গেল। রাজারাম ও জয়রামকে কিন্তু ইহলোকে আর কেহ দেখিল না। শূন্য দুর্গ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে দেশ শান্ত হইল। কয়েক মাস পরে রাজারামের পরিবার ও অনুচরগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দুর্গের পাথরগুলি ছাড়া আর কিছুই নাই; তুলিয়া লইয়া যাইবার মত যাহা কিছু ছিল সিপাহীরা লইয়া গিয়াছে। দুর্গের স্থানে স্থানে, এমন কি ঘরের মেঝেয় সিপাহীরা পাথর তুলিয়া গর্ত খুঁড়িয়াছে; বোধকরি ভূ-প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়াছে। কিছু পাইয়াছে কিনা অনুমান করা যায় না, কারণ রাজারাম কোথায় ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কেবল তিনি এবং জয়রাম জানিতেন। হয়তো সিপাহীরা সব কিছুই লুটিয়া লইয়া গিয়াছে; হয়তো কিছুই পায় নাই, তাই পিতাপুত্রকে হত্যা করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অসহায়া দুইটি নারী কয়েকটি শিশুকে লইয়া কিছুকাল দুর্গে রহিল, কিন্তু যে দুর্গ একদিন গৃহ ছিল তাহা এখন শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে ভৃত্য ও কর্মচারীরা একে একে

খসিয়া পড়িতে লাগিল; কারণ সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য শুধু গৃহই যথেষ্ট নয়, অন্নবস্ত্রেরও প্রয়োজন। অবশেষে একদিন দুইটি বিধবা শিশুগুলির হাত ধরিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইল তাহার কোনও ইতিহাস নাই। সম্ভবতঃ বাংলা দেশে কোনও দূর আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় পাইল। পরিত্যক্ত দুর্গ শৃগালের বাসভূমি হইল।

অতঃপর প্রায় ষাট বছর এই বংশের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বংশের দুইটি যুবক আবার মাথা তুলিলেন। রামবিনোদ ও রামকিশোর সিংহ দুই ভাই। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহারা মানুষ হইয়াছিলেন, কিন্তু বংশের ঐতিহ্য ভোলেন নাই। দুই ভাই ব্যবসা আরম্ভ করিলেন, এতদিন পরে কমলা আবার তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথমে ঘৃতের, পরে লোহার কারবার করিয়া তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন।

বড় ভাই রামবিনোদ কিন্তু বেশিদিন বাঁচিলেন না। যৌবন কালেই হঠাৎ রহস্যময়ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল। রামকিশোর একাই ব্যবসা চালাইলেন এবং আরও অর্থ অর্জন করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। রামকিশোর বিবাহ করিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা জন্মিল। তারপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষে রামকিশোর প্রাচীন কালের পৈতৃক সম্পত্তি পুনরায় ক্রয় করিয়া দুর্গের পাশের দ্বিতীয় চূড়ায় নূতন গৃহ নির্মাণ করাইলেন, আশেপাশে বহু জমিদারী কিনিলেন এবং সপরিবারে শৈল-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। দুর্গটিকেও পূর্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অল্প-বিস্তর মেরামত করানো হইল; কিন্তু তাহা আগের মতই অব্যবহৃত পড়িয়া রহিল।

২

পাথরের পাটি বসানো সাবেক পথটি গিরিচূড়ার পাদমূলে আসিয়া শেষ হয় নাই কিছুদূর চড়াই উঠিয়াছে। যেখানে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে পাথরের ধারে একটি বৃহৎ কূপ। কূপের সরসতায় পুষ্ট হইয়া কয়েকটি বড় বড় গাছ তাহার চারিপাশে ব্যূহ রচনা করিয়াছে।

এখান হইতে রাস্তা প্রায় পঞ্চাশ গজ চড়াই উঠিয়া একটি দেউড়ির সম্মুখে শেষ হইয়াছে। তারপর পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি সর্পজিহ্বার মত দুই ভাগ হইয়া দুই দিকে গিয়াছে; একটি গিয়াছে দুর্গের তোরণদ্বার পর্যন্ত, অন্যটি রামকিশোরের বাসভবনে উপনীত হইয়াছে।

দেউড়িতে মোটর রাখিবার একটি লম্বা ঘর এবং চালকের বাসের জন্য ছোট ছোট দুটি কুঠুরি। এখানে রামকিশোরের সাবেক মোটর ও তাহার সাবেক চালক বুলাকিলাল থাকে।

এখান হইতে সিঁড়ির যে ধাপগুলি রামকিশোরের বাড়ির দিকে উঠিয়াছে, সেগুলি একেবারে খাড়া ওঠে নাই, একটু ঘুরিয়া পাহাড়ের অঙ্গ বেড়িয়া উঠিয়াছে। চওড়া সিঁড়িগুলি বাড়ির সদর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

পাহাড়ের মাথার উপর জমি চৌরস করিয়া তাহার মাঝখানে বৃহৎ বাড়ি। বাড়ি ঘিরিয়া ফল-ফুলের বাগান, বাগান ঘিরিয়া ফণি-মনসার বেড়া। এখানে দাঁড়াইলে পাশেই শত হস্ত দূরে সর্বোচ্চ শিখরে ধূম্রবর্ণ দুর্গ দেখা যায়, উত্তরদিকে ছয় মাইল দূরে শহরটি অস্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়ে। দক্ষিণে চড়াইয়ের মূলদেশ হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে; যতদূর দৃষ্টি যায় নিবিড় তরুশ্রেণী। এ জঙ্গলটিও রামকিশোরের সম্পত্তি। শাল সেগুন আবলুস কাঠ হইতে বিস্তর আয় হয়।

রামকিশোর যখন প্রথম এই গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স চল্লিশের নীচেই; শরীরও বেশ মজবুত এবং নীরোগ। তথাপি অর্থোপার্জনের জন্য দৌড়াদৌড়ির

আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই বোধ করি তিনি স্বেচ্ছায় এই অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন তাঁহার স্ত্রী, দুইটি পুত্র, একটি কন্যা, বহু চাকর-বাকর এবং প্রবীণ নায়েব চাঁদমোহন দত্ত।

ক্রমে রামকিশোরের আর একটি পুত্র ও কন্যা জন্মিল। তারপর তাঁহার স্ত্রী গত হইলেন। পাঁচটি পুত্র-কন্যার লালন-পালনের ভার রামকিশোরের উপর পড়িল।

পুত্র-কন্যারা বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। রামকিশোর কিন্তু পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারিলেন না। বড় হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-কন্যাগুলির স্বভাব প্রকটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই বন্য স্থানে সকল সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে হয়তো তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়াছিল। বড় ছেলে বংশীধর দুর্দান্ত ক্রোধী, রাগ হইলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বহরমপুর কলেজে পড়িতে গেল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই সেখানে কি একটা অতি গর্হিত দুষ্কর্ম করার ফলে তাহাকে কলেজ ছাড়িতে হইল। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহার দুষ্কৃতির স্বরূপ প্রকাশ করিলেন না; কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন রামকিশোরের বাল্যবন্ধু, তিনি ব্যাপারটাকে চাপা দিলেন। এমন কি রামকিশোরও প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন না। তিনি জানিতে পারিলে হয়তো অনর্থ ঘটিত।

বংশীধর আবার বাড়িতে আসিয়া বসিল। বাপকে বলিল, সে আর লেখাপড়া করিবে না, এখন হইতে জমিদারী দেখাশুনা করিবে। রামকিশোর বিরক্ত হইয়া বকাবকি করিলেন, কিন্তু ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিলেন না। বংশীধর জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। নায়েব চাঁদমোহন দত্ত হাতে ধরিয়া তাহাকে কাজ শিখাইলেন।

যথাসময়ে রামকিশোর বংশীধরের বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরেই বধূর অপঘাত মৃত্যু হইল। বংশীধর গৃহে ছিল না, জমিদারী পরিদর্শনে গিয়াছিল। একদিন সকালে বধূকে গৃহে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুই চূড়ার মধ্যবর্তী খাঁজের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল। বধূ বোধ করি রাত্রে কোনও কারণে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া খাদের কিনারায় গিয়াছিল, তারপর পা ফস্কাইয়া নীচে পড়িয়াছে। মৃত্যু রহস্যজনক। বংশীধর ফিরিয়া আসিয়া বধূর মৃত্যুর সংবাদে একেবারে ফাটিয়া পড়িল; উন্মত্ত ক্রোধে ভাই বোন কাহাকেও সে দোষারোপ করিতে বিরত হইল না। ইহার পর হইতে তাহার ভীষণ প্রকৃতি যেন ভীষণতর হইয়া উঠিল।

রামকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র মুরলীধর; বংশীধরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। গিরগিটির মত রোগা হাড়-বাহির করা চেহারা, ধূর্তামিভরা ছুঁচালো মুখ; চোখ এমন সাংঘাতিক ট্যারা যে, কখন কোন্ দিকে তাকাইয়া আছে বুঝিতে পারা যায় না। তার উপর মেরুদণ্ডের নাুব্জতা শীর্ণ দেহটাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়াছে। মুরলীধর জন্মাবধি বিকলাঙ্গ। তাহার চরিত্রও বংশীধরের বিপরীত; সে রাগী নয়, মিটমিটে শয়তান। কিশোর বয়সে দুই ভায়ে একবার ঝগড়া হইয়াছিল, বংশী মুরলীর গালে একটি চড় মারিয়াছিল। মুরলীর গায়ে জোর নাই। সে তখন চড় হজম করিয়াছিল; কিন্তু কয়েকদিন পরে বংশী হঠাৎ এমন ভেদবমি আরম্ভ করিল যে যায়-যায় অবস্থা। এ ব্যাপারে মুরলীর যে কোনও হাত আছে তাহা ধরা গেল না; কিন্তু তদবধি বংশী আর কোনও দিন তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে নাই। তর্জন গর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

মুরলীধর লেখাপড়া শেখে নাই, তার উপর ওই চেহারা; বাপ তাহার বিবাহ দিলেন না। সে আপন মনে থাকে এবং দিবারাত্র পান-সুপারি চিবায়। তাহার একটি খাস চাকর আছে, নাম গণপৎ। গণপৎ মুরলীধরেরই সমবয়স্ক; বেঁটে নিরেট চেহারা, গোল মুখ, চক্ষু দুটিও গোল, ভ্রূযুগল অর্ধচন্দ্রাকৃতি। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় সে সর্বদাই শিশুসুলভ বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া আছে। অথচ তাহার মত দুষ্ট খুব কম দেখা যায়। এমন দুষ্কর্ম নাই যাহা গণপতের অসাধ্য; নারীহরণ হইতে গৃহদাহ পর্যন্ত, প্রভুর আদেশ পাইলে সে সব কিছুই করিতে পারে। প্রভু-ভৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শোনা

যায়, ইহারা দুইজনে মিলিয়া অনেক দুষ্কৃতি করিয়াছে, কিন্তু কখনও ধরা পড়ে নাই।

রামকিশোরের তৃতীয় সন্তানটি কন্যা, নাম হরিপ্রিয়া। সে মুরলীধর অপেক্ষা বছর চারেকের ছোট; দেখিতে শুনিতে ভালই, কোনও শারীরিক বিকলতা নাই। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি যেন বিষমাখানো। মনও ঈর্ষার বিষে ভরা। হরিপ্রিয়া নিজের ভাই-বোনদের দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। সকলের ছিদ্রান্বেষণ, পান হইতে চুণ খসিলে তীব্র অসন্তোষ এবং তদুপযোগী বচন-বিন্যাস, এই ছিল হরিপ্রিয়ার স্বভাব। বংশীধরের বিবাহের পর যখন নববধূ ঘরে আসিল, তখন হরিপ্রিয়ার ঈর্ষার জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বধূটি ভালমানুষ ও ভীরু স্বভাব; হরিপ্রিয়া পদে পদে তাহার খুঁৎ ধরিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া বাক্যবাণে জর্জর করিয়া তুলিল।

তারপর অকস্মাৎ বধূর মৃত্যু হইল। এই দুর্যোগ কাটিয়া যাইবার কয়েক মাস পরে রামকিশোর কন্যার বিবাহ দিলেন। শ্বশুর-ঘর করিতে পারিবে না বুঝিয়া তিনি দেখিয়া শুনিয়া একটি গরীব ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। ছেলেটির নাম মণিলাল; লেখাপড়ায় ভাল, বি. এস-সি. পাশ করিয়াছে; স্বাস্থ্যবান, শান্ত প্রকৃতি, বিবাহের পর মণিলাল শ্বশুরগৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল।

হরিপ্রিয়া ও মণিলালের দাম্পত্য জীবন সুখের হইল কিনা বাহির হইতে বোঝা গেল না। মণিলাল একেই চাপা প্রকৃতির যুবক, তার উপর দরিদ্র ঘরজামাই; অ-সুখের কারণ ঘটিলেও সে নীরব রহিল। হরিপ্রিয়াও নিজের স্বামীকে অন্যের কাছে লঘু করিল না। বরং তাহার ভ্রাতারা মণিলালকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিলে সে ফোঁস করিয়া উঠিত।

একটি বিষয়ে নবদম্পতির মধ্যে প্রকাশ্য ঐক্য ছিল। মণিলাল বিবাহের পর শ্বশুরের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্যালকদের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কাহারও প্রতি অনুরাগ বিরাগ ছিল না; কিন্তু শ্বশুরের প্রতি যে তাহার অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে তাহা তাহার প্রতি বাক্যে ও আচরণে প্রকাশ পাইত। হরিপ্রিয়াও পিতাকে ভালবাসিত; পিতাকে ছাড়া আর কাহাকেও বোধ হয় সে অন্তরের সহিত ভালবাসিত না। ভালবাসিবার শক্তি হরিপ্রিয়ার খুব বেশী ছিল না।

হরিপ্রিয়ার পর দু'টি ভাই বোন; কিশোর বয়স্ক গদাধর এবং সর্বকনিষ্ঠা তুলসী। গদাধর একটু হাবলা গোছের, বয়সের অনুযায়ী বুদ্ধি পরিণত হয় নাই। কাছা কোঁচার ঠিক থাকে না, অকারণে হি হি করিয়া হাসে। লেখাপড়ায় তাহারও মন নাই; গুলতি লইয়া বনে পাখি শিকার করিয়া বেড়ানো তাহার একমাত্র কাজ।

এই কাজে ছোট বোন তুলসী তাহার নিত্য সঙ্গিনী। তুলসীর বুদ্ধি কিন্তু গদাধরের মত নয়, বরং বয়সের অনুপাতে একটু বেশী। ছিপছিপে শরীর, সুশ্রী পাংলা মুখ, অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতি। দুপুরবেলা জঙ্গলের মধ্যে পাখির বাসা বা খরগোশের গর্ত খুঁজিয়া বেড়ানো এবং সকল বিষয়ে গদাধরের অভিভাবকতা করা তাহার কাজ। বাড়িতে কে কোথায় কি করিতেছে কিছুই তুলসীর চক্ষু এড়ায় না। সে কখন কোথায় থাকে তাহাও নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নয়। তবু সব ভাইবোনের মধ্যে তুলসীকেই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রকৃতিস্থ বলা চলে।

রামকিশোরের সংসারে পুত্রকন্যা ছাড়া আর একটি পোষ্য ছিল যাহার পরিচয় আবশ্যক। ছেলেটির নাম রমাপতি। দুঃস্থ স্বজাতি দেখিয়া রামকিশোর তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। রমাপতি ম্যাট্রিক পাস; সে গদাধর ও তুলসীকে পড়াইবে এই উদ্দেশ্যেই রামকিশোর তাহাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। রমাপতির চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সহিত মাস্টারের সাক্ষাৎকার বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। রমাপতি মুখচোরা ও লাজুক স্বভাবের ছেলে, ছাত্র-ছাত্রী তাহাকে অগ্রাহ্য করিত; বাড়ির অন্য সকলে তাহার আকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব লক্ষ্যই করিত না। এমনিভাবে দু'বেলা দু'মুঠি অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য রমাপতি বাড়ির এক কোণে পড়িয়া থাকিত।

গায়েব চাঁদমোহন দত্তের উল্লেখ পূর্বেই হইয়াছে। তিনি রামকিশোর অপেক্ষা পাঁচ-ছয়

বছরের বড়; রামকিশোরের কর্ম-জীবনের আরম্ভ হইতে তাঁহার সঙ্গে আছেন। বংশীধর জমিদারী পরিচালনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার পর তাঁহার একপ্রকার ছুটি হইয়াছিল। কিন্তু তবু তিনি কাজকর্মের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখিতেন; আয় ব্যয় হিসাব নিকাশ সমস্তই তাঁহার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখিত। লোকটি অতিশয় হুঁসিয়ার ও বিষয়জ্ঞ; দীর্ঘকাল একত্র থাকিয়া বাড়ির একজন হইয়া গিয়াছিলেন।

রামকিশোর পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু স্নেহের বশে এবং বয়োধর্মে মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। যৌবনকালে তাঁহার প্রকৃতি দুর্জয় ও অসহিষ্ণু ছিল, এখন অনেকটা নরম হইয়াছে। পূর্বে পুরুষকারকেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতেন, এখন অদৃষ্টকে একেবারে অস্বীকার করেন না। ধর্মকর্মের প্রতি অধিক আসক্তি না থাকিলেও ঠাকুরদেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, হয়তো তাঁহার প্রভাব রামকিশোরের জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। অন্তত পুত্র-কন্যাদের নামকরণের মধ্যে সে প্রভাবের ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

তবু, কদাচিৎ কোনও কারণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার প্রচণ্ড অন্তঃপ্রকৃতি বাহির হইয়া আসিত, কলসীর মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যের মত কঠিন হিংস্র ক্রোধ প্রকাশ হইয়া উঠিত। তখন তাঁহার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না, এমন কি বংশীধর পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া যাইত। তাঁহার ক্রোধ কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না, দপ করিয়া জ্বলিয়া আবার দপ করিয়া নিভিয়া যাইত।

৩

হরিপ্রিয়ার বিবাহের আট নয় মাস পরে শীতের শেষে একদল বেদে-বেদেনী আসিয়া কুয়ার সন্নিকটে আস্তানা গাড়িল। তাহাদের সঙ্গে একপাল গাধা কুকুর মুরগী সাপ প্রভৃতি জন্তুজানোয়ার। তাহারা রাত্রে ধুনি জ্বালিয়া মদ্যপান করিয়া মেয়ে-মদ্দ নাচগান হুল্লোড় করে, দিনের বেলা জঙ্গলে কাঠ কাটে, ফাঁদ পাতিয়া বনমোরগ খরগোশ ধরে, কূপের জল যথেচ্ছা ব্যবহার করে। বেদে জাতির নীতিজ্ঞান কোনও কালেই খুব প্রখর নয়।

রামকিশোর প্রথমটা কিছু বলেন না, কিন্তু ক্রমে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, গদাধর ও তুলসী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বেদের তাঁবুগুলির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অনেক শাসন করিয়াও তাহাদের বিনিদ্র কৌতূহল দমন করা গেল না। বাড়ির বয়স্থ লোকেরা অবশ্য প্রকাশ্যে বেদে-পল্লীকে পরিহার করিয়া চলিল; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে বাড়ির চাকর-বাকর এবং মালিকদের মধ্যে কেহ কেহ যে সেখানে পদার্পণ করিত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বেদেনী যুবতীদের রূপ যত না থাক মোহিনী শক্তি আছে।

হপ্তাখানেক এইভাবে কাটিবার পর একদিন কয়েকজন বেদে-বেদেনী একেবারে রাম-কিশোরের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শিলাজিৎ, কস্তুরী মৃগের নাভি, সাপের বিষ, গন্ধকমিশ্র সাবান প্রভৃতির পসরা খুলিয়া বসিল। বংশীধর উপস্থিত ছিল, সে মার-মার করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিল। রামকিশোর হুকুম দিলেন, আজই যেন তাহারা এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

বেদেরা এই আদেশ পালন করিল বটে, কিন্তু পুরাপুরি নয়। সন্ধ্যার সময় তাহারা ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া দুই তিন শত গজ দূরে জঙ্গলের কিনারায় গিয়া আবার আস্তানা গাড়িল। পরদিন সকালে বংশীধর তাহা দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। বন্দুক লইয়া সে তাঁবুতে উপস্থিত হইল, সঙ্গে কয়েকজন চাকর। বংশীধরের হুকুম পাইয়া চাকরেরা বেদেদের পিটাইতে আরম্ভ করিল, বংশীধর বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিল। এবার বেদেরা সত্যই এলাকা ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

আপদ দূর হইল বটে, কিন্তু নায়েব চাঁদমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কাজটা বোধহয় ভাল হল না। ব্যাটারা ভারি শয়তান, হয়তো অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে।'

বংশীধর উদ্ধতভাবে বলিল, 'কি অনিষ্ট করতে পারে ওরা?'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'তা কি বলা যায়। হয়তো কুয়োয় বিষ ফেলে দিয়ে যাবে, নয়তো জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেবে—'

কিছুদিন সকলে সতর্ক রহিলেন, কিন্তু কোনও বিপদাপদ ঘটিল না। বেদেরা কোনও প্রকার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই, কিম্বা করিলেও তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই।

মাসখানেক পরে রামকিশোর পরিবারবর্গকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে বনভোজনে গেলেন। ইহা তাঁহার একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। বনের মধ্যে চাঁদোয়া টাঙানো হয়; ভৃত্যেরা পাঁঠা কাটিয়া রন্ধন করে; ছেলেরা বন্দুক লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পশুপক্ষীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কর্তা চাঁদোয়ার তলে বসিয়া চাঁদমোহনের সঙ্গে দু'চার বাজি দাবা খেলেন। তারপর অপরাহ্ণে সকলে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

সকালবেলা দলবল লইয়া রামকিশোর উদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঘন শালবনের মধ্যে একটি স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে; মাটির উপর শতরঞ্চি পাতা, মাথার উপর চন্দ্রাতপ। পাচক উনান জ্বালিতেছে, চাকর-বাকর রান্নার উদ্যোগ করিতেছে। মোটর চালক বুলাকিলাল একরাশ সিদ্ধির পাতা লইয়া হামান্‌দিস্তায় কুটিতে বসিয়াছে, বৈকালে ভাঙের সরবৎ হইবে। আকাশে স্বর্ণাভ রৌদ্র, শালবনের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া বাতাস মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও কোনও দুর্লক্ষণের চিহ্নমাত্র নাই।

দুই বৃদ্ধ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া দাবার ছক পাতিলেন; আর সকলে বনের মধ্যে এদিক ওদিক অদৃশ্য হইয়া গেল। বংশীধর বন্দুক কাঁধে ফেলিয়া এক দিকে গেল, মুরলীধর নিত্যসঙ্গী গণপৎকে লইয়া অন্য দিকে শিকার সন্ধানে গেল। দু'জনেই ভাল বন্দুক চালাইতে পারে। গদাধর ও তুলসী একসঙ্গে বাহির হইল; মাস্টার রমাপতি দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। কারণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে বালকবালিকার পথ হারানো অসম্ভব নয়। রামকিশোর বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ওদের চোখে চোখে রেখো।'

জামাই মণিলাল একখানা বই লইয়া আস্তানা হইতে কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে গিয়া বসিল। রামকিশোর তাহাকে তন্ত্র সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই দিয়াছিলেন, তাহাই সে মনোযোগের সহিত দাগ দিয়া পড়িতেছিল। তাহার শিকারের শখ নাই।

বাকি রহিল কেবল হরিপ্রিয়া। সে কিছুক্ষণ রান্নার আয়োজনের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইল, একবার স্বামীর গাছতলার দিকে গেল, তারপর একাকিনী বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ একদিনের জন্য সকলে স্বাধীন হইয়াছে; একই বাড়িতে এতগুলো লোক একসঙ্গে থাকিয়া যেন পরস্পরের সান্নিধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাই বনের মধ্যে ছাড়া পাইয়া একটু নিঃসঙ্গতা উপভোগ করিয়া লইতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। দুই বৃদ্ধ খেলায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন, জঙ্গলের অভ্যন্তর হইতে থাকিয়া থাকিয়া বন্দুকের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, রন্ধনের সুগন্ধ বাতাস আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে গিরিচূড়ায় চূণকাম করা বাড়ি এবং ভাঙা দুর্গ দেখা যাইতেছে। বেশী দূর নয়, বড় জোর আধ মাইল। ভাঙা দুর্গের ছায়া মাঝের খাদ লঙ্ঘন করিয়া সাদা বাড়ির উপর পড়িয়াছে।

হঠাৎ একটা তীব্র একটানা চীৎকার অলস বনমর্মরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। দাবা খেলোয়াড় দুইজন চমকিয়া চোখ তুলিলেন। গাছের তলায় মণিলাল বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, তুলসী শালবনের আলোছায়ার ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে এবং তারস্বরে চীৎকার করিতেছে।

তুলসী চাঁদোয়া পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই মণিলাল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার কাঁধে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'এই তুলসী! কি হয়েছে! চেঁচাচ্ছিস কেন?'

তুলসী পাগলের মত ঘোলাটে চোখ তুলিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর আগের

মতই চীৎকার করিয়া বলিল,—'দিদি! গাছতলায় পড়ে আছে—বোধহয় মরে গেছে! শীগ্‌গির এসো—বাবা, জেঠামশাই, শীগ্‌গির এসো।'

তুলসী যেদিক হইতে আসিয়াছিল আবার সেই দিকে ছুটিয়া চলিল; মণিলালও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। দুই বৃদ্ধ আলুথালুভাবে তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

প্রায় দুইশত গজ দূরে ঘন গাছের ঝোপ; তুলসী ঝোপের কাছে আসিয়া একটা গাছের নীচে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। হরিপ্রিয়া বাসন্তী রঙের শাড়ি পরিয়া আসিয়াছিল, দেখা গেল সে ছায়াঘন গাছের তলায় পড়িয়া আছে, আর, কে একটা লোক তাহার শরীরের উপর ঝুঁকিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে।

পদশব্দ শুনিয়া রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ ভয়ে শীর্ণ, সে স্খলিত স্বরে বলিল, 'সাপ! সাপে কামড়েছে।'

মণিলাল তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল, তারপর দুই বাহু দ্বারা হরিপ্রিয়াকে তুলিয়া লইল। হরিপ্রিয়ার তখন জ্ঞান নাই। বাঁ পায়ের গোড়ালির উপর সাপের দাঁতের দাগ; পাশাপাশি দুটি রক্তবর্ণ চিহ্ন।

৪

হরিপ্রিয়া বাঁচিল না, বাড়িতে লইয়া যাইতে যাইতে পথেই তাহার মৃত্যু হইল।

জঙ্গলে ইতিপূর্বে কেহ বিষধর সাপ দেখে নাই। এবারও সাপ চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু সাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না; এবং ইহা যে বেদেদের কাজ, তাহারাই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে সাপ কিম্বা সাপের ডিম ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু বেদের দল তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না।

হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কিছুদিন রামকিশোরের বাড়ির উপর অভিশাপের মত একটা থমথমে ছায়া চাপিয়া রহিল। রামকিশোর তাঁহার সকল সন্তানদের মধ্যে হরিপ্রিয়াকেই বোধহয় সবচেয়ে বেশী ভালবাসিতেন; তিনি দারুণ আঘাত পাইলেন। মণিলাল অতিশয় সম্বৃতচরিত্র যুবক, কিন্তু সেও এই আকস্মিক বিপর্যয়ে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা হইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে তাহার নবগঠিত জীবনের ভিত্তি একেবারে ধ্বসিয়া গিয়াছিল।

আর একজন এই অনর্থপাতে গুরুতর ভাবে অভিভূত হইয়াছিল, সে তুলসী। তুলসী যে তাহার দিদিকে খুব বেশী ভালবাসিত তা নয়, বরং দুই বোনের মধ্যে খিটিমিটি লাগিয়াই থাকিত। হরিপ্রিয়া সুযোগ পাইলেই তুলসীকে শাসন করিত, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত। তবু, হরিপ্রিয়ার মৃত্যু চোখের সামনে দেখিয়া তুলসী কেমন যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন বনের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সে অদূরে গাছতলায় হলুদবর্ণ শাড়ি দেখিয়া সেই দিকে গিয়াছিল; তারপর দিদিকে ঐভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ভীতভাবে ডাকাডাকি করিয়াছিল। হরিপ্রিয়া কেবল একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সেই হইতে তুলসীর ধন্দ লাগিয়া গিয়াছিল। ভূতগ্রস্তের মত শঙ্কিত চক্ষু মেলিয়া সে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত। তাহার অপরিণত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বংশীধর এবং মুরলীধরও ধাক্কা পাইয়াছিল কিন্তু এতটা নয়। বংশীধর গুম হইয়া গিয়াছিল; মনে মনে সে হয়তো হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দোষী করিতেছিল; বেদেদের উপর অতটা জুলুম না করিলে বোধ হয় এ ব্যাপার ঘটিত না। মুরলীধরের বাহ্য

চালচলনে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় নাই বটে কিন্তু সেও কচ্ছপের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছিল। দুই ভ্রাতার মধ্যে কেবল একটি বিষয়ে ঐক্য হইয়াছিল, দুইজনেই মণিলালকে বিষচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেন হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য মণিলালই দায়ী।

হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর একমাস পরে মণিলাল রামকিশোরের কাছে গিয়া বিদায় চাহিল। এ সংসারের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে, এই কথার উল্লেখ করিয়া সে সজল চক্ষে বলিল, 'আপনার স্নেহ কখনও ভুলব না। কিন্তু এ পরিবারে আর তো আমার স্থান নেই।'

রামকিশোরের চক্ষুও সজল হইল। তিনি বলিলেন, 'কেন স্থান নেই? যে গেছে সে তো গেছেই, আবার তোমাকেও হারাবো? তা হবে না। তুমি থাকো। যদি ভগবান করেন আবার হয়তো সম্পর্ক হবে।'

বংশীধর ও মুরলীধর উপস্থিত ছিল। বংশীধর মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল; মুরলীধরের ঠোঁট অসন্তোষে বাঁকা হইয়া উঠিল। ইঙ্গিতটা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

মণিলাল রহিয়া গেল। পূর্বাপেক্ষাও নিস্পৃহ এবং নির্লিপ্তভাবে ভূতপূর্ব শ্বশুর-গৃহে বাস করিতে লাগিল।

অতঃপর বছর দুই নিরুপদ্রবে কাটিয়া গিয়াছে। রামকিশোরের সংসার আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কেবল তুলসী পূর্বের মত ঠিক প্রকৃতিস্থ হইল না। তাহার মনে এমন গুরুতর ধাক্কা লাগিয়াছিল, যাহার ফলে তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দশ বছর বয়সে তাহার দেহ-মন যেরূপ অপরিণত ছিল, তের বছরে পা দিয়াও তেমনি অপরিণত আছে। মোট কথা, যৌবনোদ্গমের স্বাভাবিক বয়সে উপনীত হইয়াও সে বালিকাই রহিয়া গিয়াছে।

উপরন্তু তাহার মনে আর একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে-মাস্টারের প্রতি পূর্বে তাহার অবহেলার অন্ত ছিল না, অহেতুকভাবে সে সেই মাস্টারের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে মাস্টার রমাপতি যতটা আনন্দিত হইয়াছে, তাহার অধিক সংকোচ ও অশান্তি অনুভব করিতেছে। কারণ অবহেলায় যাহারা অভ্যস্ত, একটু সমাদর পাইলে তাহারা বিব্রত হইয়া ওঠে।

যাহোক, রামকিশোরের সংসার-যন্ত্র আবার সচল হইয়াছে এমন সময় বাড়িতে একজন অতিথি আসিলেন। ইনি রামকিশোরের যৌবনকালের বন্ধু। আসলে রামকিশোরের দাদা রামবিনোদের সহিত ইঁহার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। রামবিনোদের অকালমৃত্যুর পর রাম-কিশোরের সহিত তাঁহার সখ্য-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রীতির সূত্র একেবারে ছিন্ন হয় নাই। ইনি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। নাম ঈশানচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বছর আগে বংশীধর যখন কলেজে দুষ্কৃতি করার ফলে বিতাড়িত হইতেছিল, তখন ইনিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ঈশানচন্দ্রের চেহারা তপঃকৃশ সন্ন্যাসীর ন্যায় শুষ্কশীর্ণ, প্রকৃতি ঈষৎ তিক্তরসাক্ত। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়াছিল, অর্থেরও বোধকরি অনটন ঘটিয়াছিল। তিনি পূর্ব ঘনিষ্ঠতা স্মরণ করিয়া রামকিশোরকে পত্র লিখিলেন; তোমাদের অনেকদিন দেখি নাই, কবে আছি কবে নাই, ওখানকার জলহাওয়া নাকি ভাল, ইত্যাদি। রামকিশোর উত্তরে অধ্যাপক মহাশয়কে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া পত্র লিখিলেন, এখানকার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তুমি এস, দু'এক মাস থাকিলেই শরীর সারিয়া যাইবে।

যথাসময়ে ঈশানচন্দ্র আসিলেন এবং বাড়িতে অধিষ্ঠিত হইলেন। বংশীধর কিছু জানিত না, সে খাস-আবাদী ধান কাটাইতে গিয়াছিল; বাড়ি ফিরিয়া ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে তাহার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। বংশীধর ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিল; তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়া আবার ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল। সে ঈশানচন্দ্রের কাছে

আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'আপনি এখানে?'

ঈশানচন্দ্র কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রাক্তন শিষ্যের পানে চাহিয়া থাকিয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'এসেছি। তোমার আপত্তি আছে নাকে?'

বংশীধর তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'শুনে যান। একটা কথা আছে।'

আড়ালে গিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কি কথা হইল, তাহা কেহ জানিল না। কিন্তু বাক্যবিনিময় যে আনন্দদায়ক হয় নাই তাহা প্রমাণ হইল যখন ঈশানচন্দ্র রামকিশোরকে গিয়া বলিলেন যে, তিনি আজই চলিয়া যাইতে চান। রামকিশোর তাঁহার অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন; শেষ পর্যন্ত রফা হইল অধ্যাপক মহাশয় দুর্গে গিয়া থাকিবেন। দুর্গের দু'একটি ঘর বাসোপযোগী আছে; অধ্যাপক মহাশয়ের নির্জনবাসে আপত্তি নাই। তাঁহার খাদ্য দুর্গে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঈশানচন্দ্রকে দুর্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামকিশোর ফিরিয়া আসিলেন এবং বংশীধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতাপুত্রে সওয়াল জবাব চলিল। হঠাৎ রামকিশোর খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উগ্রকণ্ঠে পুত্রকে ভর্ৎসনা করিলেন। বংশীধর কিন্তু চেঁচামেচি করিল না, আরক্ত চক্ষে নিষ্ফল ক্রোধ ভরিয়া তিরস্কার শুনিল।

যাহোক, ঈশানচন্দ্র দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। রাত্রে তিনি একাকী থাকেন কিন্তু দিনের বেলা বংশীধর ও মুরলীধর ছাড়া বাড়ির আর সকলেই দুর্গে যাতায়াত করে। মুরলীধর অধ্যাপক মহাশয়ের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছিল, কারণ তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার গোপন কেলিকুঞ্জটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

অতঃপর একপক্ষ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় রামকিশোর ঈশানচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন, দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া দুর্গের সিঁড়ি ধরিবেন, দেখিতে পাইলেন কুয়ার কাছে তরুগুচ্ছের ভিতর হইতে ধুঁয়া বাহির হইতেছে। কৌতূহলী হইয়া তিনি সেইদিকে গেলেন। দেখিলেন, বৃক্ষতলে এক সাধু ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন।

সাধুর অঙ্গ বিভূতিভূষিত, মাথায় জটা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। রামকিশোর এবং সাধুবাবা অনেকক্ষণ স্থির নেত্রে পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর সাধুবাবার কণ্ঠ হইতে খল্ খল্ হাস্য নির্গত হইল।

রামকিশোরের দুর্গে যাওয়া হইল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার তাড়স দিয়া জ্বর আসিল। জ্বরের ঘোরে তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

ডাক্তার আসিল। প্রলাপ বন্ধ হইল, জ্বরও ছাড়িল। রামকিশোর ক্রমে সুস্থ হইলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁহার হৃদয়যন্ত্র গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। পূর্বে তাঁহার হৃদযন্ত্র বেশ মজবুত ছিল।

আরও একপক্ষ কাটিল। ঈশানচন্দ্র পূর্ববৎ দুর্গে রহিলেন। সাধুবাবাকে বৃক্ষমূল হইতে কেহ তাড়াইবার চেষ্টা করিল না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়, বেদেদের লইয়া যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পুনরভিনয় বাঞ্ছনীয় নয়।

১

একদিন কার্তিক মাসের সকালবেলা ব্যোমকেশ ও আমি আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসায় ডিম্ব সহযোগে চা-পান শেষ করিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী বাড়ির ভিতর গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল। পুঁটিরাম বাজারে গিয়াছিল।

ব্যোমকেশের বিবাহের পর আমি অন্য বাসা লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কারণ নবদম্পতীর জীবন নির্বিঘ্ন করা বন্ধুর কাজ। কিন্তু ব্যোমকেশ ও সত্যবতী আমাকে যাইতে দেয় নাই। সেই অবধি এই চার বছর আমরা একসঙ্গে বাস করিতেছি। ব্যোমকেশকে পাইয়া আমার ভ্রাতার অভাব দূর হইয়াছিল; সত্যবতীকে পাইয়াছি একাধারে ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূরূপে। উপরন্তু সম্প্রতি ভ্রাতুষ্পুত্র লাভের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়াছে। আশাতীত সুখ ও শান্তির মধ্যে জীবনের দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছে।

ভাগ করিয়া খবরের কাগজ পাঠ চলিতেছিল। সামনের পাতা আমি লইয়াছিলাম, ব্যোমকেশ লইয়াছিল ভিতরের পাতা। সংবাদপত্রের সদরে মোটা অক্ষরে যেসব খবর ছাপা হয়, তাহার প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি নাই, সদরের চেয়ে অলিগলিতেই তাহার মনের যাতায়াত বেশি।

হঠাৎ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানচন্দ্র মজুমদারের নাম জানো?'

চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কে তিনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। বহরমপুরে আমি কিছুদিন তাঁর ছাত্র ছিলাম। ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

বলিলাম, 'তা তুমি যখন তাঁর ছাত্র, তখন তাঁর মরবার বয়স হয়েছিল বলতে হবে।'

'তা হয়তো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। সর্পাঘাতে মারা গেছেন।'

'ও!'

'গত বছর আমরা যেখানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছিলাম, তিনি এবছর সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে।'

সাঁওতাল পরগণার সেই পাহাড়-ঘেরা শহরটি! সেখানে কয় হপ্তা বড় আনন্দে ছিলাম, যাহাদের স্মৃতি ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। মহীধরবাবু, পুরন্দর পাণ্ডে, ডাক্তার ঘটক, রজনী—

বহির্দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, ডাকপিওন। একখানা খামের চিঠি, ব্যোমকেশের নামে। আমাদের চিঠিপত্র বড় একটা আসে না। ব্যোমকেশকে চিঠি দিয়া উৎসুকভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

চিঠি পড়িয়া সে সহাস্যে মুখ তুলিল, বলিল, 'কার চিঠি বল দেখি?'

বলিলাম, 'তা কি করে জানব। আমার তো রেডিও-চক্ষু নেই।'

'ডি.এস.পি পুরন্দর পাণ্ডের চিঠি।'

সবিস্ময়ে বলিলাম, 'বল কি! এইমাত্র যে তাঁর কথা ভাবছিলাম!'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আমিও। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক মজুমদারের প্রসঙ্গও আছে।'

'আশ্চর্য!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এরকম আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটে। অনেকদিন যার কথা ভাবিনি তাকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তারপর সে সশরীরে এসে হাজির হল।—পণ্ডিতেরা বলেন, 'কইনসিডেন্স'—সমাপতন। কিন্তু এর রহস্য আরও গভীর। কোথাও একটা যোগসূত্র

আছে, আমরা দেখতে পাই না—'

'সে যাক। পাণ্ডে লিখেছেন কি?'

'পড়ে দ্যাখো।'

চিঠি পড়িলাম। পাণ্ডে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই:—

সম্প্রতি এখানে একটি রহস্যময় ব্যাপার ঘটিয়াছে। শহর হইতে কিছু দূরে পাহাড়ের উপর এক সমৃদ্ধ পরিবার বাস করেন; গৃহস্বামীর এক বৃদ্ধ বন্ধু ঈশান মজুমদার বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর কারণ সর্পাঘাত বলিয়াই প্রকাশ, কিন্তু এ বিষয়ে শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার এবং পুলিসের মনে সন্দেহ হইয়াছে। ...ব্যোমকেশবাবু রহস্য ভালবাসেন; তার উপর এখন শীতকাল, এখানকার জলবায়ু অতি মনোরম। তিনি যদি সবান্ধবে আসিয়া কিছু দিনের জন্য দীনের গরীবখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হইবে।

চিঠি পড়া শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'কি বল?'

বলিলাম, 'মন্দ কি। এখানে তোমার কাজকর্মও তো কিছু দেখছি না। কিন্তু সত্যবতী—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকে এ অবস্থায় কোথাও নিয়ে যাওয়া চলে না—'

'তা বটে। কিন্তু ও যদি যেতে চায়? কিম্বা যদি তোমাকে না ছাড়তে চায়? এ সময় মেয়েদের মন বড় অবুঝ হয়ে পড়ে, কখন কি চায় বোঝা যায় না—' ভিতর দিকে পায়ের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেলাম।

সত্যবতী প্রবেশ করিল। অবস্থাবশে তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, দেহাকৃতি ডিম-ভরা কৈ মাছের মত। সে আসিয়া একটা চেয়ারে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। আমরা নীরব রহিলাম। সত্যবতী তখন ক্লান্তিভরে বলিল, 'আমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দাও। এখানে আর ভাল লাগছে না।'

ব্যোমকেশের সহিত আমার চোখে চোখে বার্তা বিনিময় হইয়া গেল। সে বলিল, 'ভাল লাগছে না! ভাল লাগছে না কেন?'

সত্যবতী উত্তাপহীন স্বরে বলিল, 'তোমাদের আর সহ্য হচ্ছে না। দেখছি আর রাগ হচ্ছে।'

ইহা নিশ্চয় এই সময়ের একটা লক্ষণ, নচেৎ আমাদের দেখিয়া রাগ হইবার কোনও কারণ নাই। ব্যোমকেশ একটা ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাও তাহলে, আটকাব না। অজিত তোমাকে সুকুমারের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসুক।—আর আমরাও না হয় এই ফাঁকে কোথাও ঘুরে আসি।'

টেলিগ্রাম পাইয়া পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের নামাইয়া লইলেন। তাঁহার বাসায় পৌঁছিয়া অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ করিতে করিতে পরিচিত ব্যক্তিদের খোঁজখবর লইলাম। সকলেই পূর্ববৎ আছেন। কেবল মালতী দেবী আর ইহলোকে নাই; প্রোফেসর সোম বাড়ি বিক্রি করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর কাজের কথা আরম্ভ হইল। পুরন্দর পাণ্ডে অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর হাল বয়ান করিলেন। সেই সঙ্গে রামকিশোরের পারিবারিক সংস্থাও অনেকখানি জানা গেল।

অধ্যাপক মজুমদারের মৃত্যুর বিবরণ এইরূপ:—তিনি মাসখানেক দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, শরীর বেশ সারিয়াছিল। কয়েকদিন আগে তিনি রাত্রির আহার সম্পন্ন করিয়া অভ্যাসমত দুর্গের প্রাঙ্গণে পায়চারি করিলেন; সে সময় মাস্টার রমাপতি তাঁহার সঙ্গে ছিল। আন্দাজ সাড়ে নয়টার সময় রমাপতি বাড়িতে ফিরিয়া গেল; অধ্যাপক মহাশয় একাকী রহিলেন। তারপর রাত্রিকালে দুর্গে কি ঘটিল কেহ জানে না। পরদিন প্রাতঃকালেই রমাপতি আবার দুর্গে গেল। গিয়া দেখিল, অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার শয়নঘরের দ্বারের কাছে মরিয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার পায়ের গোড়ালিতে সর্পাঘাতের চিহ্ন, মাথার পিছন

দিকে ঘাড়ের কাছে একটা কালশিরার দাগ এবং ডান হাতের মুঠির মধ্যে একটি বাদশাহী আমলের চক্‌চকে মোহর।

সর্পাঘাতের চিহ্ন প্রথমে কাহারও চোখে পড়ে নাই। রামকিশোর সন্দেহ করিলেন, রাত্রে কোনও দুর্বৃত্ত আসিয়া ঈশানবাবুকে মারিয়া গিয়াছে; মস্তকের আঘাত-চিহ্ন এই অনুমান সমর্থন করিল। তিনি পুলিসে খবর পাঠাইলেন।

কিন্তু পুলিস আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই সর্প-দংশনের দাগ আবিষ্কৃত হইল। তখন আর উপায় নাই। পুলিস আসিয়া শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য লাস চালান দিল।

শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে মৃতের রক্তে সাপের বিষ পাওয়া গিয়াছে, গোখুরা সাপের বিষ। সুতরাং সর্পাঘাতই যে মৃত্যুর কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু পুরন্দর পাণ্ডে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ইহার মধ্যে একটা কারচুপি আছে।

সব শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে একথা যখন অস্বীকার করা যায় না, তখন সন্দেহ কিসের?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহের অনেকগুলো ছোট কারণ আছে। কোনোটাই স্বতন্ত্রভাবে খুব জোরালো নয় বটে, কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে একটা কিছু পাওয়া যায়। প্রথমত দেখুন, ঈশানবাবু মারা গেছেন সর্পাঘাতে। তবে তাঁর মাথায় চোট লাগল কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন হতে পারে, সাপে কামড়াবার পর তিনি ভয় পেয়ে পড়ে যান মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভব নয় কি?'

'অসম্ভব নয়। কিন্তু আরও কথা আছে। সাপ এল কোত্থেকে? আমি তন্নতন্ন করে খোঁজ করিয়েছি, কোথাও বিষাক্ত সাপের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন দু'বছর আগে রামকিশোরবাবুর মেয়েও সর্পাঘাতে মারা গিয়েছিল।'

'তাকে সাপে কামড়েছিল জংগলে। সেখানে সাপ থাকতেও পারে। কিন্তু দুর্গে সাপ উঠল কি করে? পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা অসম্ভব। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও পারে, কিন্তু ওঠবার কোনও কারণ নেই। দুর্গে ইঁদুর, ব্যাং কিচ্ছু নেই, তবে কিসের লোভে সাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠবে?'

'তাহলে—?'

'তবে যদি কেউ সাপ নিয়ে গিয়ে দুর্গে ছেড়ে দিকে থাকে, তাহলে হতে পারে।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'হুঁ, আর কিছু?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আর, ভেবে দেখুন, অধ্যাপক মহাশয়ের মুঠির মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সেটি এল কোত্থেকে?'

'হয়তো তাঁর নিজের জিনিস।'

'অধ্যাপক মহাশয়ের আর্থিক অবস্থার যে পরিচয় সংগ্রহ করেছি, তাতে তিনি মোহর হাতে নিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন বলে মনে হয় না।'

'তবে—কি অনুমান করেন?'

'কিছুই অনুমান করতে পারছি না; তাতেই তো সন্দেহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা মামুলী সর্পাঘাত নয়, এর মধ্যে রহস্য আছে।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুর আত্মীয় পরিজন কেউ নেই?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'এক বিবাহিতা মেয়ে আছে। জামাই নেপালে ডাক্তারি করে। খবর পেলাম, মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে অধ্যাপক মহাশয়ের সদ্ভাব ছিল না।'

ব্যোমকেশ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট কাটিবার পর পাণ্ডে আবার কহিলেন, 'যেসব কথা শুনলেন সেগুলোকে ঠিক প্রমাণ বলা চলে না তা মানি, কিন্তু অবহেলা করাও যায় না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আছে। রামকিশোরবাবুর বংশটা ভাল নয়।'

ব্যোমকেশ চকিত হইয়া বলিল, 'সে কি রকম?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বংশের একটা মানুষও সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। রামকিশোর-বাবুকে আপাতদৃষ্টিতে ভালমানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু সেটা পোষ-মানা বাঘের নিরীহতা; সহজাত নয়, মেকি। তাঁর অতীত জীবনে বোধ হয় কোনও গুপ্তরহস্য আছে, নৈলে যৌবন পার না হতেই তিনি এই জঙ্গলে অজ্ঞাতবাস শুরু করলেন কেন তা বোঝা যায় না। তারপর, বড় ছেলে বংশীধর একটি আস্ত কাঠগোঁয়ার; সে যেভাবে জমিদারী শাসন করে, তাতে মনে হয় সে চেঙ্গিস্ খাঁর ভায়রাভাই। শুনেছি জমিদারীতে দু'একটা খুন-জখমও করেছে, কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ নেই—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বয়স কত বংশীধরের? বিয়ে হয়েছে?'

'বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই বৌয়ের অপঘাত মৃত্যু হয়। দেখা যাচ্ছে, এ বংশে মাঝে মাঝে অপঘাত মৃত্যু লেগেই আছে।'

'এরও কি সর্পাঘাত?'

'না। দুপুর রাত্রে ওপর থেকে খাদে লাফিয়ে পড়েছিল কিম্বা কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।'

'চমৎকার বংশটি তো! তারপর বলুন।'

'মেজ ছেলে মুরলীধর আর একটি গুণধর। ট্যারা এবং কুঁজো; বাপ বিয়ে দেননি। বাপকে লুকিয়ে লোচ্চামি করে। একটা মজা দেখেছি, দুই ছেলেই বাপকে যমের মতন ভয় করে। বাপ যদি গো-বেচারি ভালমানুষ হতেন, তাহলে ছেলেরা তাঁকে অত বেশী ভয় করত না।'

'হুঁ—তারপর?'

'মুরলীধরের পরে এক মেয়ে ছিল, হরিপ্রিয়া। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। তার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তবে জামাইটি সহজ মানুষ।'

'জামাই!'

পাণ্ডে জামাই মণিলালের কথা বলিলেন। তারপর গদাধর ও তুলসীর পরিচয় দিয়া বিবরণ শেষ করিলেন, 'গদাধরটা ন্যালা-ক্যাবলা; তার যেটুকু বুদ্ধি সেটুকু দুষ্টু-বুদ্ধি। আর তুলসী—তুলসী মেয়েটা যে কী তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। নির্বোধ নয়, ন্যাকা-বোকা নয়, ইঁচড়ে পাকাও নয়; তবু যেন কেমন একরকম।'

ব্যোমকেশ ধীরে-সুস্থে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিল, 'আপনি যে-ভাবে চরিত্রগুলিকে সমীক্ষণ করেছেন, তাতে মনে হয় আপনার বিশ্বাস এদের মধ্যে কেউ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ঈশানবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

পাণ্ডে একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার সন্দেহ তাই, কিন্তু সন্দেহটা এখনও বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছয়নি। বৃদ্ধ অধ্যাপককে মেরে কার কি ইষ্টসিদ্ধি হল সেটা বুঝতে পারছি না। যাহোক, আপনার মন্তব্য এখন মুলতুবী থাক। আজ বিকেলবেলা দুর্গে যাওয়া যাবে; সেখানে সরেজমিন তজবিজ করে আপনার যা মনে হয় বলবেন।'

পাণ্ডে অফিসের কাজ দেখিতে চলিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি মনে হল?'

বলিলাম, 'সবই যেন ধোঁয়া ধোঁয়া।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ধোঁয়া যখন দেখা যাচ্ছে, তখন আগুন আছে। শাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ।'

বৈকালে পুলিসের মোটর চড়িয়া তিনজনে বাহির হইলাম। ছয় মাইল পাথুরে পথ অতিক্রম করিতে আধ ঘণ্টা লাগিল।

কুয়ার নিকট অবধি পৌঁছিয়া দেখা গেল সেখানে আর একটি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আমরাও এখানে গাড়ি হইতে নামিলাম; পাণ্ডে বলিলেন, 'ডাক্তার ঘটকের গাড়ি। আবার কারুর অসুখ নাকি!'

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, আমাদের পরিচিত ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক এ বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছি, দৃষ্টি পড়িল কুয়ার ওপারে তরুগুচ্ছ হইতে মৃদুমন্দ ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কি? ওখানে ধোঁয়া কিসের?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'একটা সাধু ওখানে আড্ডা গেড়েছে।'

'সাধু! এই জঙ্গলের মধ্যে সাধু! এখানে তো ভিক্ষা পাবার কোনও আশা নেই।'

'তা নেই। কিন্তু রামকিশোরবাবুর বাড়ি থেকে বোধ হয় বাবাজীর সিধে আসে।'

'ও। কতদিন আছেন এখানে বাবাজী?'

'ঠিক জানি না। তবে অধ্যাপক মহাশয়ের মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই আছেন।'

'তাই নাকি? চলুন, একবার সাধু দর্শন করা যাক।'

একটি গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়া কৌপীনধারী বাবাজী বসিয়া আছেন। আমরা কাছে গিয়া দাঁড়াইলে তিনি জবারক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কিছুক্ষণ অপলকনেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর শ্মশ্রুসমাকুল মুখে একটি বিচিত্র নীরব হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। পথেঘাটে যেসব ভিক্ষাজীবী সাধু-সন্ন্যাসী দেখা যায় ইনি ঠিক সেই জাতীয় নন। কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে। কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক আভিজাত্য কিনা বুঝিতে পারিলাম না।

পাণ্ডে বলিলেন, 'এবার কোথায় যাবেন? আগে রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন, না দুর্গ দেখবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুর্গটাই আগে দেখা যাক।'

দেউড়ির পাশ দিয়া দুর্গের সিঁড়ি ধরিব, মোটর চালক বুলাকিলাল তাহার কোটর হইতে বাহিরে আসিয়া ডি.এস.পি সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডে বলিলেন, 'বুলাকিলাল, ডাক্তার এসেছে কেন? কারুর কি অসুখ?'

বুলাকিলাল বলিল, 'না হুজুর, ডাক্তার সাহেব এসেছে, উকিল সাহেবও এসেছেন। কি জানি কি গুফ্‌ত-গু হচ্ছে।'

'উকিল? হিমাংশুবাবু?'

'জী হুজুর। একসঙ্গে এসেছেন। এত্তালা দেব?'

'থাক, আমরা নিজেরাই যাব।'

বুলাকিলাল তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, 'হুজুর, ঠাণ্ডাই তৈরি করছি। যদি হুকুম হয়—'

'ঠাণ্ডাই—ভাঙ? বেশ তো, তুমি তৈরি কর, আমরা দুর্গ দেখে এখনই ফিরে আসছি।'

'জী সরকার।'

আমরা তখন সিঁড়ি ধরিয়া দুর্গের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। পাণ্ডে হাসিয়া বলিলেন, 'বুড়ো বুলাকিলাল খাসা ভাঙ তৈরি করে। ঐ নিয়েই আছে।'

পঁচাত্তরটি সিঁড়ি ভাঙিয়া দুর্গতোরণে উপনীত হইলাম। তোরণের কবাট নাই, বহু পূর্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু পাথরের খিলান এখনও অটুট আছে। গতাগতির বাধা নাই।

তোরণপথে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহা একটি কামান। প্রথম দেখিয়া মনে হয় তাল গাছের একটা গুঁড়ি মুখ উঁচু করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। দুই শতাব্দীর রৌদ্রবৃষ্টি অনাবৃত কামানের দশ হাত দীর্ঘ দেহটিকে মরিচা ধরাইয়া শল্কাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় নিরেট লৌহস্তম্ভটি জগদ্দল ভারি, বহুকাল কেহ তাহাকে নাড়াচাড়া করে নাই। তাহার ভিতরের গোলা ছুঁড়িবার ছিদ্রটি বেশী ফাঁদালো নয়, কোনও ক্রমে একটি ছোবড়া-ছাড়ানো নারিকেল তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাও বর্তমানে ধূলামাটিতে ভরাট হইয়া গিয়াছে; মুখের দিকটায় একগুচ্ছ সজীব ঘাস মাথা বাহির করিয়া আছে। অতীতের সাক্ষী ক্ষয়িষ্ণু দুর্গটির তোরণমুখে ভূপতিত কামানটিকে দেখিয়া কেমন যেন মায়া হয়; মনে হয় যৌবনে সে বলদৃপ্ত যোদ্ধা ছিল, জরার বশে ধরাশায়ী হইয়া সে ঊর্ধ্বমুখে মৃত্যুর দিন গুনিতেছে।

কামান ছাড়া অতীতকালের অস্থাবর বস্তু দুর্গমধ্যে আর কিছু নাই। প্রাকার-ঘেরা দুর্গভূমি আয়তনে দুই বিঘার বেশী নয়; সমস্তটাই পাথরের পাটি দিয়া বাঁধানো। চক্রাকার প্রাকারের গায়ে ছোট ছোট কুঠুরি; বোধ হয় পূর্বকালে এগুলিতে দুর্গরক্ষক সিপাহীরা থাকিত। এগুলির অবস্থা ভগ্নপ্রায়; কোথাও পাথর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দ্বারের সম্মুখে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে। এই চক্রের মাঝখানে নাভির ন্যায় দুর্গের প্রধান ভবন। নাভি ও নেমির মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের অবকাশ।

গৃহটি চতুষ্কোণ এবং বাহির হইতে দেখিলে মজবুত বলিয়া মনে হয়। পাঁচ ছয়টি ছোট বড় ঘর লইয়া গৃহ; মামুলিভাবে মেরামত করা সত্ত্বেও সব ঘরগুলি বাসের উপযোগী নয়। কোনও ঘরের দেয়ালে ফাটল ধরিয়াছে, কোনও ঘরের ছাদ ফুটো হইয়া আকাশ দেখা যায়। কেবল পিছন দিকের একটি ছোট ঘর ভাল অবস্থায় আছে। যদিও চুণ সুরকি খসিয়া স্থূল পাথরের গাঁথুনি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে তবু ঘরটিকে বাসোপযোগী করিবার জন্য তাহার প্রবেশ-পথে নূতন চৌকাঠ ও কবাট লাগানো হইয়াছে।

আমরা অন্যান্য ঘরগুলি দেখিয়া এই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডে চৌকাঠের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, 'অধ্যাপক মহাশয়ের লাস ঐখানে পড়ে ছিল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'সাপে কামড়াবার পর তিনি যদি চৌকাঠে মাথা ঠুকে পড়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে মাথায় চোট লাগা অসম্ভব নয়।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'না, অসম্ভব নয়। কিন্তু সারা বাড়িটা আপনি দেখেছেন; ভাঙ্গা বটে কিন্তু কোথাও এমন আবর্জনা নেই যেখানে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। অধ্যাপক মহাশয় বাস করতে আসার সময় এখানে ভাল করে কার্বলিক অ্যাসিডের জল ছড়ানো হয়েছিল, তারপরও তিনি বেঁচে থাকাকালে বার দুই ছড়ানো হয়েছে—'

'অধ্যাপক মহাশয় আসবার আগে এখানে কেউ বাস করত না?'

পাণ্ডে মুখ টিপিয়া বলিলেন, 'কেউ কবুল করে না। কিন্তু মুরলীধর—'

'হুঁ—বুঝেছি।' বলিয়া ব্যোমকেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরটি লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ চৌদ্দ ফুট। মেঝে শান বাঁধানো। একপাশে একটি তক্তপোশ এবং একটি আরাম-কেদারা ছাড়া ঘরে অন্য কোনও আসবাব নাই। অধ্যাপক মহাশয়ের ব্যবহারের জন্য যে-সকল তৈজস ছিল তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এই ঘরে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম যাহা অন্য কোনও ঘরে নাই। তিনটি দেয়ালে মেঝে হইতে প্রায় এক হাত ঊর্ধ্বে সারি সারি লোহার গজাল ঠোকা রহিয়াছে, গজালগুলি দেয়াল হইতে দেড় হাত বাহির হইয়া আছে। সেগুলি আগে বোধ হয় শাবলের মত স্থূল ছিল, এখন মরিচা ধরিয়া যেরূপ ভঙ্গুর আকৃতি ধারণ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় সেগুলি জানকীরামের সমসাময়িক।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেয়ালে গোঁজ কেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'এ ঘরটা বোধহয় সেকালে দুর্গের দপ্তর কিম্বা খাজনাখানা ছিল। গোঁজের ওপর তক্তা পেতে দিলে বেশ তাক হয়, তাকের ওপর নানান জিনিসপত্র, বই খাতা,

এমন কি টাকার সিন্দুক রাখা চলত। এখনও বিহারের অনেক সাবেক বাড়িতে এইরকম গোঁজ দেখা যায়।'

ব্যোমকেশ ঘরের মেঝে ও দেয়ালের উপর চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। এক সময় বলিল, 'অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয় বাক্স-বিছানা এনেছিলেন। সেগুলো কোথায়?'

'সেগুলো আমাদের অর্থাৎ পুলিসের জিম্মায় আছে।'

'বাক্সর মধ্যে কি আছে দেখেছেন?'

'গোটাকয়েক জামা কাপড় আর খান-তিন-চার বই খাতা। একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা তিনটে দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা পয়সা ছিল।'

'আর তাঁর মুঠির মধ্যে যে মোহর পাওয়া গিয়েছিল সেটা?'

'সেটাও আমাদের জিম্মায় আছে। এ মামলার একটা নিষ্পত্তি হলে সব জিনিস তাঁর ওয়ারিসকে ফেরত দিতে হবে।'

ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ ঘর পরীক্ষা করিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। তখন সে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'চলুন। এখানকার দেখা শেষ হয়েছে।'

দুর্গ প্রাঙ্গণে আসিয়া আমরা তোরণের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, একটি ছোকরা তোরণ দিয়া প্রবেশ করিল। মাস্টার রমাপতিকে এই প্রথম দেখিলাম। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, ময়লা রঙ, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ; কিন্তু সঙ্কুচিত ভাব। বয়স উনিশ-কুড়ি। তাহাকে দেখিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'কি মাস্টার, কি খবর?'

রমাপতি একটু অপ্রতিভ হাসিয়া বলিল, 'বাড়িতে ডাক্তারবাবু আর উকিলবাবু এসেছেন। তাঁদের নিয়ে কর্তার ঘরে কি সব কাজের কথা হচ্ছে। বড়রা সবাই সেখানে আছেন। কিন্তু গদাই আর তুলসীকে দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম হয়তো তারা এখানে এসেছে।'

'না, তাদের তো এখানে দেখিনি।' পাণ্ডে আমাদের সহিত রমাপতির পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'এঁরা আমার বন্ধু, এখানে বেড়াতে এসেছেন।'

রমাপতি একদৃষ্টে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া সংহত স্বরে বলিল, 'আপনি কি—সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ! কিন্তু চিনলেন কি করে? আমার ছবি তো কোথাও বেরোয়নি।'

রমাপতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, স্খলিত স্বরে বলিল, 'আমি—না, ছবি দেখিনি—কিন্তু দেখে মনে হল—আপনার বই পড়েছি—ক'দিন ধরে মনে হচ্ছিল—আপনি যদি আসতেন তাহলে নিশ্চয় এই ব্যাপারের মীমাংসা হত—' সে থতমত খাইয়া চুপ করিল।

ব্যোমকেশ সদয় হাসিয়া বলিল, 'আসুন, আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করা যাক।'

নিকটেই কামান পড়িয়াছিল, ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া তাহার উপর বসিল, পাশের স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন।' রমাপতি সসঙ্কোচে তাহার পাশে বসিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি বললেন আমি এলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে। ঈশানবাবু তো সাপের কামড়ে মারা গেছেন। এর মীমাংসা কী হবে?'

রমাপতি উত্তর দিল না, শঙ্কিত নতমুখে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া অঙ্গুষ্ঠের নখ খুঁটিতে লাগিল। ব্যোমকেশ তাহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া সহজ স্বরে বলিল, 'যাক ও কথা। ঈশানবাবু যে-রাত্রে মারা যান সে-রাত্রে প্রায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কি কথা হচ্ছিল?'

রমাপতি এবার সতর্কভাবে উত্তর দিল, বলিল, 'উনি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি ওঁর কাছে এলে আমার সঙ্গে নানারকম গল্প করতেন। সে-রাত্রে—'

'সে-রাত্রে কোন্ গল্প বলছিলেন?'

'এই দুর্গের ইতিহাস বলছিলেন।'

'দুর্গের ইতিহাস! তাই নাকি! কি ইতিহাস শুনলেন বলুন তো, আমরাও শুনি।'

আমি ও পাণ্ডে গিয়া কামানের উপর বসিলাম। রমাপতি যে গল্প শুনিয়াছিল তাহা

বলিল। রাজা জানকীরাম হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজারাম ও জয়রাম পর্যন্ত কাহিনী বলিয়া গেল।

শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, সত্যি ইতিহাস বলেই মনে হয়। কিন্তু এ ইতিহাস তো পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় না। ঈশানবাবু জানলেন কি করে?'

রমাপতি বলিল, 'উনি সব জানতেন। কর্তার এক ভাই ছিলেন, কম বয়সে মারা যান, তাঁর নাম ছিল রামবিনোদ সিংহ, অধ্যাপক মশায় তাঁর প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তাঁর মুখে উনি এসব কথা শুনেছিলেন; রামবিনোদবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বংশের সব ইতিহাস এঁর জানা ছিল। একটা খাতায় সব লিখে রেখেছিলেন।'

'খাতায় লিখে রেখেছিলেন? কোথায় খাতা?'

'এখন খাতা কোথায় তা জানি না। কিন্তু আমি দেখেছি। বোধহয় ওঁর তোরঙ্গের মধ্যে আছে।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডের পানে তাকাইল। পাণ্ডে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'পেন্সিলে লেখা একটা খাতা আছে, কিন্তু তাতে কি লেখা আছে তা জানি না। বাংলায় লেখা।'

'দেখতে হবে; যা হোক—' ব্যোমকেশ রমাপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনার কাছে অনেক খবর পাওয়া গেল।—আচ্ছা, পরদিন সকালে সবার আগে আপনি আবার দুর্গে এসেছিলেন কেন, বলুন তো?'

রমাপতি বলিল, 'উনি আমাকে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল ভোরবেলা এসো, বাকি গল্পটা বলব!'

'বাকি গল্পটা মানে—?'

'তা কিছু খুলে বলেননি। তবে আমার মনে হয়েছিল যে সিপাহী যুদ্ধের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ বংশের ইতিহাস আমাকে শোনাবেন।'

'কিন্তু কেন? আপনাকে এ ইতিহাস শোনাবার কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি—?'

'তা জানি না; তাঁর যখন যা মনে আসত আমাকে বলতেন, আমারও ভাল লাগত তাই শুনতাম। মোগল-পাঠান আমলের অনেক গল্প বলতেন। একদিন বলেছিলেন, যে-বংশে একবার ভ্রাতৃহত্যার বিষ প্রবেশ করেছে সে-বংশের আর রক্ষা নেই; যতবড় বংশই হোক তার ধ্বংস অনিবার্য। এই হচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য।'

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। পাণ্ডের ললাট ভ্রূকুটি-বন্ধুর হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চলুন, এবার ওদিকে যাওয়া যাক।'

খাদের ওপারে বাড়ির আড়ালে সূর্য তখন ঢাকা পড়িয়াছে।

৩

দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, বুলাকিলাল দুইটি বৃহৎ পাত্রে ভাঙের সরবৎ লইয়া ঢালাঢালি করিতেছে; গদাধর এবং তুলসী পরম আগ্রহভরে দাঁড়াইয়া প্রক্রিয়া দেখিতেছে।

আমাদের আগমনে গদাধর বিরাট হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল; তুলসী সংশয়-সঙ্কুল চক্ষু আমাদের উপর স্থাপন করিয়া কোণাচে ভাবে সরিয়া গিয়া মাস্টার রমাপতির হাত চাপিয়া ধরিল। রমাপতি তিরস্কারের সুরে বলিল, 'কোথায় ছিলে তোমরা? আমি চারিদিকে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

তুলসী জবাব দিল না, অপলক দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল। গদাধরের গলা হইতে একটি ঘড়্‌ঘড়্‌ হাসির শব্দ বাহির হইল। সে বলিল, 'সাধুবাবা গাঁজা খাচ্ছিল তাই দেখছিলাম।'

রমাপতি ধমক দিয়া বলিল, 'সাধুর কাছে যেতে তোমাদের মানা করা হয়নি?'

গদাধর বলিল, 'কাছে তো যাইনি, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।'

'আচ্ছা, হয়েছে—এবার বাড়ি চল।' রমাপতি তাহাদের লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। শুনিতে পাইলাম, কয়েক ধাপ উঠিবার পর তুলসী বাগ্রকণ্ঠে বলিতেছে, 'মাস্টারমশাই, ওরা সব কারা?'

বুলাকিলাল গেলাস ভরিয়া আমাদের হাতে দিল। দধি গোলমরিচ শসার বীচি এবং আরও বহুবিধ বকাল সহযোগে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ভাঙের সরবৎ; এমন সরবৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। পাণ্ডে তারিফ করিয়া বলিলেন, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু বুলাকিলাল, তুমি এত ভাঙ তৈরি করেছ কার জন্যে? আমরা আসব তা তো জানতে না।'

বুলাকিলাল বলিল, 'হুজুর, আমি আছি, সাধুবাবাও এক ঘটি চড়ান্—'

'সাধুবাবার দেখছি কিছুতেই অরুচি নেই। আর—'

'আর—গণপৎ এক ঘটি নিয়ে যায়।'

'গণপৎ—মুরলীধরের খাস চাকর? নিজের জন্যে নিয়ে যায়, না মালিকের জন্যে?'

'তা জানি না হুজুর।'

'আচ্ছা বুলাকিলাল, তুমি তো এ বাড়ির পুরোনো চাকর, বাড়িতে কে কোন্ নেশা করে বলতে পারো?'

বুলাকিলাল একটু চুপ করিয়া বলিল, 'বড়কর্তা সন্ধ্যের পর আফিম খান। আর কারুর কথা জানি না ধর্মাবতার।'

বোঝা গেল, জানিলেও বুলাকিলাল বলিবে না। আমরা সরবৎ শেষ করিয়া, আর এক প্রস্থ তারিফ করিয়া বাড়ির সিঁড়ি ধরিলাম।

এদিকেও সিঁড়ির সংখ্যা সত্তর-আশী। উপরে উঠিয়া দেখা গেল, সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও বেশ আলো আছে। বাড়ির সদরে রমাপতি উপস্থিত ছিল, সে বলিল, 'কর্তার সঙ্গে দেখা করবেন? আসুন।'

রমাপতি আমাদের যে ঘরটিতে লইয়া গেল সেটি বাড়ির বৈঠকখানা।

টেবিল চেয়ার ছাড়াও একটি ফরাস-ঢাকা বড় তক্তপোশ আছে। তক্তপোশের মধ্যস্থলে রামকিশোরবাবু আসীন; তাঁহার এক পাশে নায়েব চাঁদমোহন, অপর পাশে জামাই মণিলাল। দুই ছেলে বংশীধর ও মুরলীধর তক্তপোশের দুই কোণে বসিয়াছে। ডাক্তার ঘটক এবং উকিল হিমাংশুবাবু তক্তপোশের কিনারায় চেয়ার টানিয়া উপবিষ্ট আছেন। পশ্চিম দিকের খোলা জানালা দিয়া ঘরে আলো আসিতেছে; তবু ঘরের ভিতরটা ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে শুনিতে পাইলাম, মুরলীধর পেঁচালো সুরে বলিতেছে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ! মণিলালকে দুর্গ দেওয়া হবে কেন? আমি কি ভেসে এসেছি? দুর্গ আমি নেব।'

বংশীধর অমনি বলিয়া উঠিল, 'তুমি নেবে কেন? আমার দাবী আগে, দুর্গ আমি নেব। আমি ওটা মেরামত করিয়ে ওখানে বাস করব।'

রামকিশোর বারুদের মত ফাটিয়া পড়িলেন, 'খবরদার! আমার মুখের ওপর যে কথা বলবে জুতিয়ে তার মুখ ছিঁড়ে দেব। আমার সম্পত্তি আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যাব। মণিলালকে আমি সর্বস্ব দিয়ে যাব, তোমাদের তাতে কি! বেয়াদব কোথাকার!'

মণিলাল শান্তস্বরে বলিল, 'আমি তো কিছুই চাইনি—।'

মুরলীধর মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'না, কিছুই চাওনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাবাকে বশ করেছ। মিট্‌মিটে ডান—'

রামকিশোর আবার ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন, ডাক্তার ঘটক হাত তুলিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু, আপনি বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, আপনার শরীরের পক্ষে ওটা ভাল নয়। আজ বরং কথাবার্তা বন্ধ থাক্, আর একদিন হবে।'

রামকিশোরবাবু ঈষৎ সংযত হইয়া বলিলেন, 'না ডাক্তার, এ ব্যাপার টাঙিয়ে রাখা চলবে না। আজ আছি কাল নেই, আমি সব হাঙ্গামা চুকিয়ে রাখতে চাই। হিমাংশুবাবু, আমি আমার সম্পত্তির কি রকম ব্যবস্থা করতে চাই আপনি শুনেছেন; আর বেশী আলোচনার দরকার নেই। আপনি দলিলপত্র তৈরি করতে আরম্ভ করে দিন। যত শীগ্‌গির দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে যায় ততই ভাল।'

'বেশ, তাই হবে। আজ তাহলে ওঠা যাক্।' হিমাংশুবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। এতক্ষণে সকলের নজর পড়িল যে আমরা তিনজন ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি। রামকিশোর ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন, 'কে?'

পাণ্ডে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি। আমার দু'টি কলকাতার বন্ধু বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের দুর্গ দেখাতে এনেছিলাম।' বলিয়া ব্যোমকেশের ও আমার নামোল্লেখ করিলেন।

রামকিশোর সমাদর সহকারে বলিলেন, 'আসুন, আসুন। বসতে আজ্ঞা হোক।' কিন্তু তিনি ব্যোমকেশের নাম পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

বংশীধর ও মুরলীধর উঠিয়া গেল। ডাক্তার ঘটক আমাদের দেখিয়া একটু বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইল, তারপর হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। ডাক্তারের সঙ্গে দু'একটা কথা হইবার পর সে উকিল হিমাংশুবাবুকে লইয়া প্রস্থান করিল। ঘরের মধ্যে রহিয়া গেলাম আমরা তিনজন এবং ও-পক্ষে রামকিশোরবাবু, নায়েব চাঁদমোহন এবং জামাই মণিলাল।

রামকিশোর হাঁকিলেন, 'ওরে কে আছিস, আলো দিয়ে যা, চা তৈরি কর।'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'আমি দেখছি—'

তিনি উঠিয়া গেলেন। চাঁদমোহনের চেহারা কালো এবং চিম্‌শে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ধূর্ততা ভরা। তিনি যাইবার সময় ব্যোমকেশের প্রতি একটি দীর্ঘ-গভীর অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

দুই চারিটি সৌজন্যসূচক বাক্যালাপ হইল। বাহিরের লোকের সহিত রামকিশোরের ব্যবহার বেশ মিষ্ট ও অমায়িক। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনলাম ঈশানবাবু এখানে এসে সর্পাঘাতে মারা গেছেন। আমি তাঁকে চিনতাম, একসময় তাঁর ছাত্র ছিলাম।'

'তাই নাকি!' রামকিশোর চকিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, 'আমার বড় ছেলেও—। কি বলে, ঈশান আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, ছেলেবেলার বন্ধু। সে আমার বাড়িতে বেড়াতে এসে অপঘাতে মারা গেল, এ লজ্জা আমি জীবনে ভুলব না।' তাঁহার কথার ভাবে মনে হইল, সর্পাঘাতে মৃত্যু সম্বন্ধে যে সন্দেহ আছে তাহা তিনি জানেন না।

ব্যোমকেশ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি আপনার দাদারও বন্ধু ছিলেন?'

রামকিশোর ক্ষণেক নীরব থাকিয়া যেন একটু বেশী ঝোঁক দিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু দাদা প্রায় ত্রিশ বছর হল মারা গেছেন।'

'ও—তাহলে বর্তমানে আপনার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।—আচ্ছা, তিনি এবার এখানে আসার আগে এ বাড়ির কে কে তাঁকে চিনতেন? আপনি চিনতেন। আর—?'

'আর আমার নায়েব চাঁদমোহন চিনতেন।'

'আপনার ড্রাইভার তো পুরোনো লোক, সে চিনত না?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলাল চিনত।'

'আর, আপনার বড় ছেলেও বোধহয় তাঁর ছাত্র ছিলেন?'

গলাটা পরিষ্কার করিয়া রামকিশোর বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'এই বাক্যালাপ যখন চলিতেছিল তখন জামাই মণিলালকে লক্ষ্য করিলাম। ভোজনরত মানুষের পাতের কাছে বসিয়া পোষা বিড়াল যেমন একবার পাতের দিকে একবার মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চক্ষু সঞ্চালন করে, মণিলাল তেমনি কথা বলার পর্যায়ক্রমে ব্যোমকেশ ও রামকিশোরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছে। তাহার মুখের ভাব আধা-অন্ধকারে ভাল ধরা

গেল না, কিন্তু সে যে একাগ্রমনে বাক্যালাপ শুনিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুর মুঠিতে একটি মোহর পাওয়া গিয়েছিল। সেটি কোথা থেকে এল বলতে পারেন?'

রামকিশোর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। ঈশানের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অন্তত মোহর নিয়ে বেড়াবার মত ছিল না।'

'দুর্গে কোথাও কুড়িয়ে পাওয়া সম্ভব নয় কি?'

রামকিশোর বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 'সম্ভব। কারণ আমার পূর্ব-পুরুষদের অনেক সোনা-দানা ঐ দুর্গে সঞ্চিত ছিল। সিপাহীরা যখন লুঠ করতে আসে তখন এক-আধটা মোহর এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়া বিচিত্র নয়। তা যদি হয় তাহলে ও মোহর আমার সম্পত্তি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার সম্পত্তি হলে ঈশানবাবু মোহরটি আপনাকে ফেরত দিতেন না কি? আমি যতদূর জানি, পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার লোক তিনি ছিলেন না।'

'তা ঠিক। কিন্তু অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তা ছাড়া, মোহরটা কুড়িয়ে পাবার সময়েই হয়তো তাকে সাপে কামড়েছিল। বেচারা সময় পায়নি।'

এই সময় একজন ভৃত্য কেরোসিনের ল্যাম্প আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল, অন্য একজন ভৃত্য চা এবং জলখাবারের ট্রে লইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। আমরা সবিনয়ে জলখাবার প্রত্যাখ্যান করিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলাম।

চায়ে চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা নেই। ঈশানবাবুও নিশ্চয় রাত্রে কেরোসিনের লণ্ঠন ব্যবহার করতেন?'

রামকিশোর বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগে সে একবার আমার কাছ থেকে একটা ইলেকট্রিক টর্চ চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর আর সব জিনিসই পাওয়া গেল, কেবল ঐ টর্চটা পাওয়া যায়নি।'

'তাই নাকি! কোথায় গেল টর্চটা?'

এতক্ষণে মণিলাল কথা কহিল, গম্ভীর মুখে বলিল, 'আমার বিশ্বাস ঐ ঘটনার পরদিন সকালবেলা গোলমালে কেউ টর্চটা সরিয়েছে।'

পাণ্ডে প্রশ্ন করিলেন, 'কে সরাতে পারে? কারুর ওপর সন্দেহ হয়?'

মণিলাল উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল, রামকিশোর মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, 'না না, মণি, ও তোমার ভুল ধারণা। রমাপতি নেয়নি, নিলে স্বীকার করত।'

মণিলাল আর কথা কহিল না, ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া রহিল। বুঝিলাম, টর্চ হারানোর প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এবং মণিলালের সন্দেহ মাস্টার রমাপতির উপর। একটা ক্ষুদ্র পারিবারিক মতান্তর ও অস্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

অতঃপর চা শেষ করিয়া আমরা উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সূত্রে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হল। বড় সুন্দর জায়গায় বাড়ি করেছেন। এখানে একবার এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।'

রামকিশোর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'বেশ তো, দু'দিন না হয় থেকে যান না। দু'দিন পরে কিন্তু প্রাণ পালাই-পালাই করবে। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে তাই থাকতে পারি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার নিমন্ত্রণ মনে রাখব। কিন্তু যদি আসি, ঐ দুর্গে থাকতে দিতে হবে। ক্ষুধিত পাষাণের মত আপনার দুর্গটা আমাকে চেপে ধরেছে।'

রামকিশোর বিরসমুখে বলিলেন, 'দুর্গে আর কাউকে থাকতে দিতে সাহস হয় না। যাহোক, যদি সত্যিই আসেন তখন দেখা যাবে।'

দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, কালো পর্দার আড়ালে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তুলসী এতক্ষণ পর্দার কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল, এখন সরীসৃপের মত সরিয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর পাণ্ডেজির বাসার খোলা ছাদে তিনটি আরাম-কেদারায় আমরা তিনজনে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছিলাম। অন্ধকারে ধূমপান চলিতেছিল। এখানে কার্তিক মাসের এই সময়টি বড় মধুর; দিনে একটু মোলায়েম গরম, রাত্রে মোলায়েম ঠাণ্ডা।

পাণ্ডে বলিলেন, 'এবার বলুন কি মনে হল।'

ব্যোমকেশ সিগারেটে দু' তিনটা টান দিয়া বলিল, 'আপনি ঠিক ধরেছেন, গলদ আছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে যতক্ষণ না চেপে বসা যাচ্ছে ততক্ষণ গলদ ধরা যাবে না।'

'আপনি তো আজ তার গৌরচন্দ্রিকা করে এসেছেন। কিন্তু নিতান্তই কি দরকার—?'

'দরকার। এতদূর থেকে সুবিধা হবে না। ওদের সঙ্গে ভাল করে মিশতে হবে তবে ওদের পেটের কথা জানা যাবে। আজ লক্ষ্য করলাম, কেউ মন খুলে কথা কইছে না, সকলেই কিছু-না-কিছু চেপে যাচ্ছে।'

'হুঁ। তাহলে আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে ঈশানবাবুর মৃত্যুটা স্বাভাবিক সর্পাঘাতে মৃত্যু নয়?'

'অতটা বলবার এখনও সময় হয়নি। এইটুকু বলতে পারি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তা সত্যি নয়, ভেতরে একটা গূঢ় এবং চমকপ্রদ রহস্য রয়েছে। মোহর কোথা থেকে এল? টর্চটা কোথায় গেল? রমাপতি যে-গল্প শোনালে তা কি সত্যি? সবাই দুর্গটা চায় কেন? মণিলালকে কর্তা ছাড়া কেউ দেখতে পারে না কেন?'

আমি বলিলাম, 'মণিলালও রমাপতিকে দেখতে পারে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা স্বাভাবিক। ওরা দু'জনেই রামকিশোরবাবুর আশ্রিত। রমাপতিও বোধহয় মণিলালকে দেখতে পারে না। বাড়ির কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সেটা আমাদের পক্ষে সুবিধে।' দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেট ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা পাণ্ডেজি, বংশীধর কতদূর লেখাপড়া করেছে জানেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ম্যাট্রিক পাশ করেছে জানি। তারপর বহরমপুরে পড়তে গিয়েছিল, কিন্তু মাস কয়েক পরেই পড়াশুনা বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে।'

'গোলমাল ঠেকছে। বহরমপুরে ঈশানবাবুর সঙ্গে বংশীধরের জানা-শোনা হয়েছিল—তারপর বংশীধর হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দিলে কেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'খোঁজ নিতে পারি। বেশী দিনের কথা নয়, যদি গোলমাল থাকে কলেজের সেরেস্তায় হদিস পাওয়া যাবে।'

'খবর নেবেন তো।—আর মুরলীধরের বিদ্যে কতদূর?'

'ওটা আকাট মুখ্খু।'

'হুঁ, বংশটাই চাষাড়ে হয়ে গেছে। তবে রামকিশোরবাবুর ব্যবহারে একটা সাবেক ভদ্রতা আছে।'

'কিন্তু বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে খুব বেশী শোক পেয়েছেন বলে মনে হল না; বরং মোহরটি বাগাবার মতলব।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি।—কাল সকালে ঈশানবাবুর জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করতে হবে, খাতাটা পড়তে হবে। তাতে হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'তারপর?'

'তারপর দুর্গে গিয়ে গ্যাট্ হয়ে বসব। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

'ভাল। কিন্তু একটা কথা ওদের দেওয়া খাবার খাওয়া চলবে না। কি জানি কার মনে কি আছে—'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন। আপনার ইক্‌মিক্ কুকার আছে?'

'আছে।'

'বাস্, তাহলেই চলবে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশ আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'অজিত,

রামকিশোরবাবুকে দেখে কিছু মনে হল?'

'কি মনে হবে?'

'আজ তাঁকে দেখেই মনে হল, আগে কোথায় দেখেছি। তোমার মনে হল না?'

'কৈ না!'

'আমার কিন্তু এক নজর দেখেই মনে হল চেনা লোক। কিন্তু কবে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

পাণ্ডে একটা হাই চাপিয়া বলিলেন, 'রামকিশোরবাবুকে আপনার দেখার সম্ভাবনা কম; গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি লোকালয়ে পা বাড়িয়েছেন কিনা সন্দেহ। আপনি হয়তো ওই ধরনের চেহারা অন্য কোথাও দেখে থাকবেন।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই হবে বোধ হয়।'

৪

পরদিন প্রাতরাশের সময় পাণ্ডে বলিলেন, 'দুর্গে গিয়ে থাকার সংকল্প ঠিক আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আপনি ব্যবস্থা করুন। বড় জোর দু-তিন দিন থাকব, বেশী নয়।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার কিন্তু মন চাইছে না, কি জানি যদি সত্যিই সাপ থাকে।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'থাকলেও আমাদের কিছু করতে পারবে না। আমরা সাপের রোজা।'

'বেশ, আমি তাহলে রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব ঠিকঠাক করে আসি।—আচ্ছা, দুর্গের বদলে যদি রামকিশোরবাবুর বাড়িতে থাকেন তাতে ক্ষতি কি?'

'অত ঘেঁষাঘেঁষি সুবিধা হবে না, পরিপ্রেক্ষিত পাব না। দুর্গই ভাল।'

'ভাল। আমি অফিসে বলে যাচ্ছি, আমার মুন্‌শী আতাউল্লাকে খবর দিলে সে ঈশানবাবুর জিনিসপত্র আপনাদের দেখাবে। গুদাম ঘরের চাবি তার কাছে।'

পাণ্ডেজি মোটর-বাইকে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। ঘড়িতে মাত্র ন'টা বাজিয়াছে, পাণ্ডেজির অফিস তাঁহার বাড়িতেই; সুতরাং ঈশানবাবুর মালপত্র পরীক্ষার তাড়া নাই। আমরা সিগারেট ধরাইয়া সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইয়া গড়িমসি করিতেছি, এমন সময় একটি ছোট মোটর আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, 'ডাক্তার ঘটক। ভালই হল।'

ডাক্তার ঘটকের একটু অনুতপ্ত ভাব। আমরা যে তাহার গুপ্তকথা ফাঁস করিয়া দিই নাই এবং ভবিষ্যতে দিব না তাহা সে বুঝিয়াছে। বলিল, 'কাল আপনাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলবার সুযোগ পেলাম না, তাই—'

ব্যোমকেশ পরম সমাদরের সহিত তাহাকে বসাইয়া বলিল, 'আপনি না এলে আমরাই যেতাম। কেমন আছেন বলুন। পুরোনো বন্ধুরা সব কেমন? মহীধরবাবু?'

ডাক্তার বলিল, 'সবাই ভাল আছেন।'

ব্যোমকেশ চক্ষু মিটিমিটি করিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আর রজনী দেবী?'

ডাক্তারের কান দুটি রক্তাভ হইল, তারপর সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'ভাল আছে রজনী। আপনারা এসেছেন শুনে জানতে চাইল মিসেস বক্সী এসেছেন কি না।'

'সত্যবতী এবার আসেনি। সে—' ব্যোমকেশ আমার পানে তাকাইল।

আমি সত্যবতীর অবস্থা জানাইয়া বলিলাম, 'সত্যবতী আমাদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরাও প্রতিজ্ঞা করেছি, একটা সুখবর না পাওয়া পর্যন্ত ওমুখো হব না।'

ডাক্তার হাসিয়া ব্যোমকেশকে অভিনন্দন জানাইল, কিন্তু তাহার মুখে হাসি ভাল ফুটিল না। ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্যকে আহার করিতে দেখিলে হাসিতে পারে, কিন্তু সে হাসি আনন্দের

নয়।

ব্যোমকেশ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিল, পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'বন্ধু, মনে ক্ষোভ রাখবেন না। আপনি যা পেয়েছেন তা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। একসঙ্গে দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য আর পরকীয়াপ্রীতির তীক্ষ্ণ স্বাদ উপভোগ করে নিচ্ছেন।'

আমি যোগ করিয়া দিলাম, 'ভেবে দেখুন, শেলী বলেছেন, হে পবন, শীত যদি আসে বসন্ত রহে কি কভু দূরে! ফুলের মরসুম শেষ হোক, ফল আপনি আসবে।'

এবার ডাক্তারের মুখে সত্যকার হাসি ফুটিল। আরও কিছুক্ষণ হাসি-তামাসার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটক, কাল রামকিশোরবাবুর বাড়িতে বিষয়-ঘটিত আলোচনা খানিকটা শুনেছিলাম, বাকিটা শোনবার কৌতূহল আছে। যদি বাধা না থাকে আপনি বলুন।'

ডাক্তার বলিল, 'বাধা কি? রামকিশোরবাবু তো লুকিয়ে কিছু করছেন না। মাসখানেক আগে ওঁর স্বাস্থ্য হঠাৎ ভেঙে পড়ে; হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন অনেকটা সামলেছেন; কিন্তু ওঁর ভয় হয়েছে হঠাৎ যদি মারা যান তাহলে বড় ছেলেরা মামলা-মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট করবে। হয়তো নাবালক ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করবে। তাই বেঁচে থাকতে থাকতেই উনি সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে চান। সম্পত্তি সমান চার ভাগ হবে; দু'ভাগ বড় দুই ছেলে পাবে, বাকি দু'ভাগ রামকিশোরের অধিকারে থাকবে। তারপর ওঁর মৃত্যু হলে গদাই আর তুলসী ওয়ারিসান্‌-সূত্রে ওঁর সম্পত্তি পাবে, বড় দুই ছেলে আর কিছু পাবে না।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'বুঝেছি। দুর্গ নিয়ে কি ঝগড়া হচ্ছিল?'

'দুর্গটা রামকিশোরবাবু নিজের দখলে রেখেছেন। অথচ দুই ছেলেরই লোভ দুর্গের ওপর।'

'মণিলালকে দুর্গ দেবার কথা উঠল কেন?'

'ব্যাপার হচ্ছে এই—রামকিশোরবাবু স্থির করেছেন তুলসীর সঙ্গে মণিলালের বিয়ে দেবেন। মণিলাল ওঁর বড় মেয়েকে বিয়ে করেছিল, সে-মেয়ে মারা গেছে, জানেন বোধ হয়। কাল কথায় কথায় রামকিশোরবাবু বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর বসতবাড়িটা পাবে গদাই, আর মণিলাল পাবে দুর্গ। মণিলাল মানেই তুলসী, মণিলালকে আলাদা কিছু দেওয়া হচ্ছে না। তাইতেই বংশী আর মুরলী ঝগড়া শুরু করে দিলে।'

'হুঁ। কিন্তু তুলসীর বিয়ের তো এখনও দেরি আছে। ওর কতই বা বয়স হবে।'

'আধুনিক মতে বিয়ের বয়স না হলেও নেহাৎ ছোট নয়, বছর তের-চোদ্দ হবে। রামকিশোরবাবু বোধহয় শীগ্‌গিরই ওদের বিয়ে দেবেন। যদি হঠাৎ মারা যান, নাবালক ছেলেমেয়েদের একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক চাই তো! বড় দুই ছেলের ওপর ওঁর কিছুমাত্র আস্থা নেই।'

'যেটুকু দেখেছি তাতে আস্থা থাকার কথা নয়। মণিলাল মানুষটি কেমন?'

'মাথা-ঠাণ্ডা লোক। রামকিশোরবাবু তাই ওর ওপরেই ভরসা রাখেন বেশি। তবে যেভাবে শ্বশুরবাড়ি কামড়ে পড়ে আছে তাতে মনে হয় চক্ষুলজ্জা কম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, 'ডাক্তার ঘটক, আপনি রুগী সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকবেন।'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'রুগী! কোন্‌ রুগী?'

'রামকিশোরবাবু। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র যদি দলিল রেজিস্ট্রি হবার আগেই হঠাৎ থেমে যায় তাহলে কারুর সুবিধা হতে পারে।'

ডাক্তার চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া রহিল।

বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তার বিদায় লইলে আমরা মুন্‌শী আতাউল্লাকে খবর পাঠাইলাম।

আতাউল্লা লোকটি অতিশয় কেতাদুরস্ত প্রৌঢ় মুসলমান, বোধহয় খানদানী ব্যক্তি। কৃশ দেহে ছিটের আচকান, দাড়িতে মেহেদীর রঙ, চোখে সুর্মা, মুখে পান; তাহার চোস্ত জবানের সঙ্গে মুখ হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পানের কুচি ছিট্‌কাইয়া পড়িত। লোকটি

সজ্জন।

আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মুন্শী আতাউল্লা দুইজন আরদালির সাহায্যে ঈশানবাবুর বিছানা ও তোরঙ্গ আনিয়া আমাদের খিদ্মতে পেশ করিলেন। বিছানাটা নাম মাত্র। রঙ-ওঠা সতরঞ্চিতে জড়ানো জীর্ণ বাঁদিপোতার তোষক ও তেলচিটে বালিশ। তবু ব্যোমকেশ উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। তোষকটি ঝাড়িয়া এবং বালিশটি টিপিয়া টুপিয়া দেখিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গুপ্ত ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব ধরা পড়িল না।

বিছানা স্থানান্তরিত করিবার হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মুন্শীজী, একটা মোহর ছিল সেটা দেখতে পাওয়া যাবে কি?'

'বেশক্, জনাব। আপনার যদি মর্জি হয় তাই আমি মোহর সঙ্গে এনেছি।' আতাউল্লা আচ্কানের পকেট হইতে একটি কাঠের কৌটা বাহির করিলেন। কৌটার গায়ে নানাপ্রকার সাংকেতিক অক্ষর ও চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। ভিতরে তুলার মোড়কের মধ্যে মোহর।

পাকা সোনার মোহর; আকারে আয়তনে বর্তমান কালের চাঁদির টাকার মত। ব্যোমকেশ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, 'এতে উর্দুতে কি লেখা রয়েছে পড়তে পারেন?'

আতাউল্লা ঈষৎ আহত-কণ্ঠে বলিলেন, 'উর্দু নয় জনাব, ফারসী। আসরফিতে উর্দু লেখার রেওয়াজ ছিল না। যদি ফরমাস করেন পড়ে দিতে পারি, ফারসী আমার খাস জবান।'

ব্যোমকেশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'তাই নাকি! তাহলে পড়ে বলুন দেখি কবেকার মোহর।'

আতাউল্লা চশমা আঁটিয়া মোহরের লেখা পড়িলেন, বলিলেন, 'তারিখ নেই। লেখা আছে এই মোহর নবাব আলিবর্দি খাঁ'র আমলে ছাপা হয়েছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে জানকীরামের কালের মোহর, পরের নয়।—আচ্ছা মুন্শীজী, আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপনি অফিসে যান, যদি আবার দরকার হয় আপনাকে খবর পাঠাব।'

'মেহেরবানি' বলিয়া আতাউল্লা প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ তখন অধ্যাপক মহাশয়ের তোরঙ্গটি টানিয়া লইয়া বসিল। চটা-ওঠা টিনের তোরঙ্গটির মধ্যে কিন্তু এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহা তাঁহার মৃত্যুর কারণ-নির্দেশে সাহায্য করিতে পারে। বস্ত্রাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলি দেখিলে মনে হয় অধ্যাপক মহাশয় অল্পবিত্ত ছিলেন কিম্বা অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। দুইখানি পুরাতন মলাট-ছেঁড়া বই: একটি শ্যামশাস্ত্রী-সম্পাদিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, অন্যটি শয়র্-ই-মুতাক্ষরিনের ইংরেজী অনুবাদ। ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে অধ্যাপক মহাশয়ের জ্ঞানের পরিধি কতখানি বিস্তৃত ছিল, এই বই দু'খানি হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বই দু'খানির সঙ্গে একখানি চামড়া-বাঁধানো প্রাচীন খাতা। খাতাখানি বোধ হয় ত্রিশ বছরের পুরাতন; মলাট ঢলঢলে হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাতাগুলিও খসিয়া আসিতেছে। এই খাতায় অত্যন্ত অগোছালোভাবে, কোথাও পেন্সিল দিয়া দু'চার পাতা, কোথাও কালি দিয়া দু'চার ছত্র লেখা রহিয়াছে। হস্তাক্ষর সুছাঁদ নয়, কিন্তু একই হাতের লেখা। যাহাদের লেখাপড়া লইয়া কাজ করিতে হয় তাহারা এইরূপ একখানি সর্বংবহা খাতা হাতের কাছে রাখে; যখন যাহা ইচ্ছা ইহাতে টুকিয়া রাখা যায়।

খাতাখানি সযত্নে লইয়া আমরা টেবিলে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

প্রথম দুই-তিনটি পাতা খালি। তারপর একটি পাতায় লেখা আছে—

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
যদি মানুষের ভাষায় কথা বলিতে
পারিতেন তবে তিনি মহরমের
বাজনার ছন্দে বলিতেন—
ধনানর্জয়ধ্বম্! ধনানর্জয়ধ্বম্!

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'মহরমের বাজনার মত শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু মানে কি?'

বলিলাম, 'মানে হচ্ছে, ধন উপার্জন করহ, ধন উপার্জন করহ। তোমার ঈশানবাবু দেখছি সিনিক্ ছিলেন।'

ব্যোমকেশ লেখাটাকে আরও কিছুক্ষণ দেখিয়া পাতা উল্টাইল। পরপৃষ্ঠায় কেবল কয়েকটি তারিখ নোট করা রহিয়াছে। ঐতিহাসিক তারিখ; কবে হিজরি অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল, শশাঙ্ক দেবের মৃত্যুর তারিখ কি, এইসব। বোধ হয় ছাত্রদের ইতিহাস পড়াইবার জন্য নোট করিয়াছিলেন। এমনি আরও কয়েক পৃষ্ঠায় তারিখ লেখা আছে, সেগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

ইহার পর আরও কয়েক পাতা শূন্য। তারপর সহসা এক দীর্ঘ রচনা শুরু হইয়াছে। তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

'রামবিনোদের কাছে তাহার বংশের ইতিহাস শুনিলাম। সিপাহী-যুদ্ধের সময় লুঠেরা-গণ বোধ হয় সঞ্চিত ধনরত্ন লইয়া যাইতে পারে নাই; অন্তত রামবিনোদের তাহাই বিশ্বাস। সে দুর্গ দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার উচ্চাশা, যদি কোনও দিন ধনী হয় তখন ঐ দুর্গ কিনিয়া তথায় গিয়া বাস করিবে।'

অতঃপর জানকীরাম হইতে আরম্ভ করিয়া রাজারাম জয়রাম পর্যন্ত রমাপতির মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনি লেখা আছে, একচুল এদিক ওদিক নাই। পাঠ শেষ হইলে আমি বলিলাম, 'যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, রমাপতি মিথ্যে গল্প বলেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গল্পটা রমাপতি ঠিকই বলেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পটা ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে শুনেছিল তার প্রমাণ কি? দুদিন আগেও শুনে থাকতে পারে।'

'তা—বটে। তাহলে—?'

'তাহলে কিছু না। আমি বলতে চাই যে, ও সম্ভাবনাটাকেও বাদ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ রমাপতি সে-রাত্রে এই গল্পই শুনেছিল এবং পরদিন ভোরবেলা গল্পের বাকিটা শোনবার জন্যে ঈশানবাবুর কাছে গিয়েছিল তার কোনও প্রমাণ নেই।'

আবার কিছুক্ষণ পাতা উল্টাইবার পর এমন একটি পৃষ্ঠায় আসিয়া পৌঁছিলাম, যেখানে তীব্র কাতরোক্তির মত কয়েকটি শব্দ লেখা রহিয়াছে—

—রামবিনোদ বাঁচিয়া নাই। আমার
একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু চলিয়া গিয়াছে।
সে কি ভয়ংকর মৃত্যু! দুঃস্বপ্নের মত
সে-দৃশ্য আমার চোখে লাগিয়া আছে।

ব্যোমকেশ লেখাটার উপর কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থাপিত রাখিয়া বলিল, 'ভয়ংকর মৃত্যু! স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হয় না। খোঁজ করা দরকার।' আমার মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিল, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন।'

খাতার সামনের দিকের লেখা এইখানেই শেষ। মনে হয় রামবিনোদের মৃত্যুর পর খাতাটি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত পড়িয়া ছিল, হয়তো হারাইয়া গিয়াছিল। তারপর আবার যখন লেখা আরম্ভ হইয়াছে, তখন খাতার উল্টা পিঠ হইতে।

প্রথম লেখাটি কালি-কলমের লেখা; পীতবর্ণ কাগজে কালি চুপ্‌সিয়া গিয়াছে। পাতার মাথার দিকে লেখা হইয়াছে—

রামকিশোরের বড় ছেলে বংশীধর কলেজে পড়িতে আসিয়াছে।
অনেকদিন পরে উহাদের সঙ্গে আবার সংযোগ ঘটিল। সেই
রামবিনোদের মৃত্যুর পর আর খোঁজ লই নাই।
পাতার নীচের দিকে লেখা আছে—বংশীধর এক মারাত্মক

কেলেঙ্কারী করিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি।
হাজার হোক রামবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বংশীধরের কেলেঙ্কারীর হদিস বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কি!'

দেখা গেল বাকি পাতাগুলিতে যে লেখা আছে তাহার সবগুলিই লাল-নীল পেন্সিলে লেখা। ব্যোমকেশ পাতাগুলি কয়েকবার ওলট-পালট করিয়া বলিল, 'অজিত, তোরঙ্গর তলায় দেখ তো লাল-নীল পেন্সিল আছে কি না।'

বেশী খুঁজিতে হইল না, একটি দু'মুখো লাল-নীল পেন্সিল পাওয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, বোঝা গেল। এর পর যা কিছু লেখা আছে ঈশানবাবু দুর্গে আসার পর লিখেছেন। এগুলি তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়।'

প্রথম লেখাটি এইরূপ—

দুর্গে গুপ্তকক্ষ দেখিতে পাইলাম না।
ভারি আশ্চর্য! দুর্গের সোনাদানা কোথায় রক্ষিত হইত?
প্রকাশ্য কক্ষে রক্ষিত হইত বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়
কোথাও গুপ্তকক্ষ আছে। কিন্তু কোথায়? সিপাহীরা
গুপ্তকক্ষের সন্ধান পাইয়া থাকিলে গুপ্তকক্ষ আর গুপ্ত
থাকিত না, তাহার দ্বার ভাঙিয়া রাখিয়া যাইত, তখন
উহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইত। তবেই গুপ্তকক্ষের
সন্ধান সিপাহীরা পায় নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অধ্যাপক মহাশয়ের যুক্তিটা খুব বিচারসহ নয়। সিপাহীরা চলে যাবার পর রাজারামের পরিবারবর্গ ফিরে এসেছিল। তারা হয়তো ভাঙা তোষাখানা মেরামত করিয়েছিল, তাই এখন ধরা যাচ্ছে না।'

পাতা উল্টাইয়া ব্যোমকেশ পড়িল—

কেহ আমাকে ভয় দেখাইয়া দুর্গ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা
করিতেছে। বংশীধর? আমি কিন্তু সহজে দুর্গ ছাড়িব
না! ধনানর্জয়ধনম্! ধনানর্জয়ধনম্!

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার মহরমের বাজনা কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহরের গন্ধ পেয়ে বোধ হয় তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়েছিল।'

অতঃপর কয়েক পৃষ্ঠা পরে খাতার শেষ লেখা। আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। বাংলা ভাষায় লেখা নয়, উর্দু কিংবা ফারসীতে লেখা তিনটি পংক্তি। তাহার নীচে বাংলা অক্ষরে কেবল দুইটি শব্দ—মোহনলাল কে?

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সত্যিই তো, মোহনলাল কে? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। ডাকো মুন্‌শী আতাউল্লাকে।'

আতাউল্লা আসিয়া লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন। বলিলেন, 'জনাব, মৃত ব্যক্তি ভাল ফারসী জানতেন মনে হচ্ছে। তবে একটু সেকেলে ধরনের। তিনি লিখেছেন, 'যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।'

'মোহনলালের জিম্মায়—!'

'জী জনাব, তাই লেখা আছে।'

'হুঁ। আচ্ছা, মুন্‌শীজী, আপনি এবার জিনিসপত্র সব নিয়ে যান। কেবল এই খাতাটা আমার কাছে রইল।'

দু'জনে সিগারেট ধরাইয়া আরাম-কেদারার কোলে অঙ্গ ছড়াইয়া দিলাম। নীরবে

একটা সিগারেট শেষ করিয়া তাহারই চিতাগ্নি হইতে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'খাতা পড়ে কি মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ কেদারার দুই হাতলে তবলা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, 'মনে হচ্ছে, ধনানর্জয়ধ্বম্। ধনানর্জয়ধ্বম্।'

'ঠাট্টা নয়, কি বুঝলে বল না।'

'পরিষ্কারভাবে কিছুই বুঝিনি এখনও। তবে ঈশানবাবুকে যদি সত্যিই কেউ হত্যা করে থাকে তাহলে হত্যার একটা মোটিভ্ দেখতে পাচ্ছি।'

'কি মোটিভ্?'

'সেই চিরন্তন মোটিভ্—টাকা।'

'আচ্ছা, ফারসী ভাষায় ঐ কথাগুলো লিখে রাখার তাৎপর্য কি?'

'ওটা উনি নিজে লেখেননি। অর্থাৎ হস্তাক্ষর ওঁর, কিন্তু রচনা ওঁর নয়, রাজারামের। উনি লেখাটি দুর্গে কোথাও পেয়েছিলেন, তারপর খাতায় টুকে রেখেছিলেন।'

'তারপর?'

'তারপর মারা গেলেন।'

৫

পাণ্ডেজি ফিরিলেন বেলা বারোটার পর। হেল্‌মেট খুলিয়া ফেলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, 'কাজ হল বটে কিন্তু বুড়ো গোড়ায় গোলমাল করেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গোলমাল কিসের?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেলা হয়ে গেছে, খেতে বসে সব বলব। আপনি কিছু পেলেন?'

'খেতে বসে বলব।

আহারে বসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি আগে বলুন। কাল তো রামকিশোরবাবু নিমরাজী ছিলেন, আজ হঠাৎ বেঁকে বসলেন কেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'কাল আমরা চলে আসবার পর কেউ ওঁকে বলেছে যে আপনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ। তাতেই উনি ঘাবড়ে গেছেন।'

'এতে ঘাবড়াবার কি আছে? ওঁর মনে যদি পাপ না থাকে—'

'সেই কথাই শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতে হল। বললাম, 'হলই বা ব্যোমকেশবাবু ডিটেক্‌টিভ, আপনার ভয়টা কিসের? আপনি কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছেন?' তখন বুড়ো তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেল।'

আমি বলিলাম, 'রামকিশোরবাবু তাহলে সত্যিই কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছেন।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার তাই সন্দেহ হল। কিন্তু ঈশানবাবুর মৃত্যু-ঘটিত কোনো কথা নয়। অন্য কিছু। যাহোক, আমি ঠিক করে এসেছি, আজই ওরা দুর্গটাকে আপনাদের বাসের উপযোগী করে রাখবে। আপনারা ইচ্ছে করলে আজ বিকেলে যেতে পারেন কিম্বা কাল সকালে যেতে পারেন।'

'আজ বিকেলেই যাব।'

'তাই হবে। কিন্তু আমি আর একটা ব্যবস্থা করেছি। আমার খাস আরদালি সীতারাম আপনাদের সঙ্গে থাকবে।'

'না না, কি দরকার?'

'দরকার আছে। সীতারাম লাল পাগড়ি পরে যাবে না, সাধারণ চাকর সেজে যাবে। লোকটা খুব হুঁশিয়ার; তাছাড়া, ওর একটা মস্ত বিদ্যে আছে, ও সাপের রোজা। ও সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে। ভেবে দেখুন, আপনাদের জল তোলা কাপড় কাচা বাসন মাজার জন্যেও একজন লোক দরকার। ওদের লোক না নেওয়াই ভাল।'

ব্যোমকেশ সম্মত হইল। পাণ্ডে তখন বলিলেন, 'এবার আপনার হাল বয়ান করুন।'

ব্যোমকেশ সবিস্তারে ঈশানবাবুর খাতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিল। শুনিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ, মোহনলাল লোকটা কে ছিল আমারও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু একশো বছর পরে আর তার ঠিকানা বার করা সম্ভব হবে না। এদিকে হালের খবর ঈশানবাবু লিখছেন, তাঁকে কেউ ভয় দেখিয়ে দুর্গ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। তাঁর সন্দেহ বংশীধরের ওপর। কিন্তু সত্যি কথাটা কি? ভয়ই বা দেখালো কী ভাবে?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ সব প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া যাবে না। দেখা যাক, দুর্গে গিয়ে যদি দুর্গের রহস্য ভেদ করা যায়।'

অপরাহ্ণে পুলিস ভ্যানে চড়িয়া শৈল-দুর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা তিনজন এবং সীতারাম। পাণ্ডেজি আমাদের ঘর-বসত করিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইবেন, সীতারাম থাকিবে। সীতারামের বয়স পঁয়ত্রিশ, লিকলিকে লম্বা গড়ন, তামাটে ফর্সা রঙ, শিকারী বিড়ালের মত গোঁফ। তাহার চেহারার মাহাত্ম্য এই যে, সে ভাল কাপড়চোপড় পরিলে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়, আবার নেংটি পরিয়া থাকিলে বাসন-মাজা ভৃত্য মনে করিতে তিলমাত্র দ্বিধা হয় না। উপস্থিত তাহার পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় কাঁধে গামছা। অর্থাৎ, মোটা কাজের চাকর।

আমাদের সঙ্গে লটবহরহ কম ছিল না, বিছানা বাক্স, চাল ডাল আনাজ প্রভৃতি রসদ, ইক্‌মিক্‌ কুকার এবং আরও কত কি। সীতারাম এবং বুলাকিলাল মালপত্র দুর্গে চোলাই করিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডে বলিলেন, 'চলুন, গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করে আসবেন।'

গৃহস্বামী বাড়ির সদর বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন, সঙ্গে জামাই মণিলাল, আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন; আমরা খাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছি বলিয়া অনুযোগ করিলেন; শহুরে মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে মন বসাইতে পারিব না বলিয়া রসিকতা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু সতর্ক ও সাবধান হইয়া রহিল।

মিষ্টালাপের সময় লক্ষ্য করিলাম, বাড়ির অন্যান্য অধিবাসীরা আমাদের শুভাগমনে বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বংশীধর এবং মুরলীধর চিলের মত চক্রাকারে আমাদের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু কাছে আসিতেছে না। রমাপতি একবার বাড়ির ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া আমাদের দেখিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেল। নায়েব চাঁদমোহন বারান্দার অন্য প্রান্তে থেলো হুঁকোয় তামাক টানিতে টানিতে বক্র দৃষ্টিশলাকায় আমাদের বিদ্ধ করিতেছেন। তুলসী একটা জুঁই ঝাড়ের আড়াল হইতে কৌতূহলী কাঠবিড়ালীর মত আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম একটা থামের আড়াল হইতে সে উঁকি মারিতেছে।

ব্যোমকেশ যে একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা এবং কোনও গভীর অভিসন্ধি লইয়া দুর্গে বাস করিতে আসিয়াছে তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে এবং তদনুযায়ী উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল গদাধরের জড়বুদ্ধি বোধ হয় এতবড় ধাক্কাতেও সক্রিয় হইয়া ওঠে নাই; তাহাকে দেখিলাম না।

আমরা গাত্রোত্থান করিলে রামকিশোরবাবু বলিলেন, 'শুধু থাকার জন্যেই এসেছেন মনে করবেন না যেন। আপনারা আমার অতিথি, যখন যা দরকার হবে খবর পাঠাবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' আমরা গমনোদ্যত হইলাম। গৃহস্বামী ইশারা করিলেন, মণিলাল আমাদের সঙ্গে চলিল; উদ্দেশ্য দুর্গ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিয়া আসিবে।

সিঁড়ি দিয়া নামা ওঠার সময় মণিলালের সঙ্গে দুইচারিটা কথা হইল। ব্যোমকেশ বলিল 'আমি যে ডিটেকটিভ একথা রামকিশোরবাবু জানলেন কি করে?'

মণিলাল বলিল, 'আমি বলেছিলাম। আপনার নাম আমার জানা ছিল; এঁর লেখা বই পড়েছি। শুনে কর্তা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর আপনারা দুর্গে এসে থাকতে চান শুনে ঘাবড়ে গেলেন।'

'কেন?'

'এই সেদিন একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল—'

'তাই আপনাদের ভয় আমাদেরও সাপে খাবে। ভালো কথা, আপনার স্ত্রীও না সর্পাঘাতে মারা গিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এ অঞ্চলে দেখছি খুব সাপ আছে।'

'আছে নিশ্চয়। কিন্তু আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া আমরা দুর্গের সিঁড়ি ধরিলাম। হঠাৎ মণিলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনারা পুলিসের লোক, তাই জানতে কৌতূহল হচ্ছে—ঈশানবাবু ঠিক সাপের কামড়েই মারা গিয়েছিলেন তো?'

ব্যোমকেশ ও পাণ্ডের মধ্যে একটা চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কেন বলুন দেখি? এ বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি?'

মণিলাল ইতস্তত করিয়া বলিল, 'না—তবে—কিছুই তো বলা যায় না—'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সাপ ছাড়া আর কি হতে পারে?'

মণিলাল বলিল, 'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। ঈশানবাবুর পায়ে সাপের দাঁতের দাগ আমি নিজের চোখে দেখেছি। ঠিক যেমন আমার স্ত্রীর পায়ে ছিল।' মণিলাল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দুর্গের তোরণে আসিয়া পৌঁছিলাম। মণিলাল বলিল, 'এবার আমি ফিরে যাব। কর্তার শরীর ভাল নয়, তাঁকে বেশীক্ষণ একলা রাখতে সাহস হয় না। কাল সকালেই আবার আসব।'

মণিলাল নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। সূর্য অস্ত গিয়াছিল। রামকিশোরবাবুর বাড়ির মাথার উপর শুক্লা দ্বিতীয়ার কৃশাঙ্গী চন্দ্রকলা মুচকি হাসিয়া বাড়ির আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। আমরাও তোরণ দিয়া দুর্গের অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সকালে ডাক্তার ঘটককে তার রুগী সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলাম; এখন দেখছি তার কোনও দরকার ছিল না। সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল রেজিস্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত জামাই মণিলাল যক্ষের মত শ্বশুরকে আগলে থাকবে।'

পাণ্ডে একটু হাসিলেন, 'হ্যাঁ—ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে এদের খটকা লেগেছে দেখছি। কিন্তু এখন কিছু বলা হবে না।'

'না।'

আমরা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। পাণ্ডেজির হাতে একটি মুষলাকৃতি লম্বা টর্চ ছিল; সেটির বৈদ্যুতিক আলো যেমন দূরপ্রসারী, প্রয়োজন হইলে সেটিকে মারাত্মক প্রহরণরূপেও ব্যবহার করা চলে। পাণ্ডে টর্চ জ্বালিয়া তাহার আলো সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, 'এটা আপনাদের কাছে রেখে যাব, দরকার হতে পারে। চলুন, দেখি আপনাদের থাকার কি ব্যবস্থা হয়েছে।'

দেখা গেল সেই গজাল-কণ্টকিত ঘরটিতেই থাকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। দুইটি লোহার খাট, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব দেওয়ালের নিরাভরণ দৈন্য অনেকটা চাপা দিয়াছে। সীতারাম ইতিমধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়াছে, বিছানা পাতিয়াছে, ইক্‌মিক্‌ কুকারে রান্না চড়াইয়াছে এবং স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতেছে। তাহার কর্মতৎপরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।

অচিরাৎ ধূমায়মান চা আসিয়া উপস্থিত হইল। চায়ে চুমুক দিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'সীতারাম, কেমন দেখলে?'

সীতারাম বলিল, 'কিল্লা ঘুরে ফিরে দেখে নিয়েছি হুজুর। এখানে সাপ নেই।'

নিঃসংশয় উক্তি। পাণ্ডে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

'আর কিছু?'

'আর, সিঁড়ি ছাড়া কিল্লায় ঢোকবার অন্য রাস্তা নেই। দেয়ালের বাইরে খাড়া

পাহাড়।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'এর মানে বুঝতে পারছেন?'

'কি?'

'যদি কোনও আততায়ী দুর্গে ঢুকতে চায় তাকে সিঁড়ি দিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ, দেউড়ির পাশ দিয়ে আসতে হবে। বুলাকিলাল তাকে দেখে ফেলতে পারে।'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন। বুলাকিলালকে জেরা করতে হবে। কিন্তু আজ দেরি হয়ে গেছে, আজ আর নয়।—সীতারাম, তোমাকে বেশী বলবার দরকার নেই। এঁদের দেখাশুনা করবে, আর চোখ কান খুলে রাখবে।'

'জী হুজুর।'

পাণ্ডেজি উঠিলেন।

'কাল কোনও সময়ে আসব। আপনারা সাবধানে থাকবেন।'

পাণ্ডেজিকে দুর্গতোরণ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম। ব্যোমকেশ টর্চ জ্বালিয়া সিঁড়ির উপর আলো ফেলিল, পাণ্ডেজি নামিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে নীচে হইতে শব্দ পাইলাম পুলিস ভ্যান চলিয়া গেল। ওদিকে রামকিশোরবাবুর বাড়িতে তখন মিটিমিটি আলো জ্বালিয়াছে।

আমরা আবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আকাশে তারা ফুটিয়াছে, জঙ্গলের দিক হইতে মিষ্ট বাতাস দিতেছে। সীতারাম যেন আমাদের মনের অকথিত অভিলাষ জানিতে পারিয়া দু'টি চেয়ার আনিয়া অঙ্গনে রাখিয়াছে। আমরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উপবেশন করিলাম।

এই নক্ষত্রবিদ্ধ অন্ধকারে বসিয়া আমার মন নানা বিচিত্র কল্পনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল আমরা যেন রূপকথার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। সেই যে রাজপুত্র কোটালপুত্র কি জানি কিসের সন্ধানে বাহির হইয়া ঘুমন্ত রাজকুমারীর মায়াপুরীতে উপনীত হইয়াছিল, আমাদের অবস্থা যেন সেইরূপ। অবশ্য ঘুমন্ত রাজকুমারী নাই, কিন্তু সাপের মাথায় মণি আছে কিনা কে বলিতে পারে? কোন্ অদৃশ্য রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাহাকে পাহারা দিতেছে তাহাই বা কে জানে? শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার ন্যায় কোন অপরূপ রহস্য এই প্রাচীন দুর্গের অস্থিপঞ্জরতলে লুক্কায়িত আছে?

ব্যোমকেশ ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আমার রোমান্টিক স্বপ্নজাল ভাঙিয়া দিল। সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'ঈশানবাবু ঠিক ধরেছিলেন, দুর্গে নিশ্চয় কোথাও গুপ্ত তোষাখানা আছে।'

বলিলাম, 'কিন্তু কোথায়? এতবড় দুর্গের মাটি খুঁড়ে তার সন্ধান বার করা কি সহজ?'

'সহজ নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস ঈশানবাবু সন্ধান পেয়েছিলেন; তাঁর মুঠির মধ্যে মোহরের আর কোনও মানে হয় না।'

কথাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিলাম, 'তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে আরও অনেক মোহর আছে।'

'সম্ভব। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ঈশানবাবু যখন খুঁজে বার করতে পেরেছেন তখন আমরাও পারব।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া অন্ধকারে পায়চারি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পায়চারি করিবার পর সে হঠাৎ 'উ' বলিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে কোনক্রমে সামলাইয়া লইল। আমি লাফাইয়া উঠিলাম—'কি হল!'

'কিছু নয়, সামান্য হোঁচট খেয়েছি।' টর্চটা তাহার হাতেই ছিল, সে তাহা জ্বালিয়া মাটিতে আলো ফেলিল।

দিনের আলোতে যাহা চোখে পড়ে নাই, এখন তাহা সহজে চোখে পড়িল। একটা চৌকশ পাথর সম্প্রতি কেহ খুঁড়িয়া তুলিয়াছিল, আবার অপটু হস্তে যথাস্থানে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাথরটা সমানভাবে বসে নাই, একদিকের কানা একটু উঁচু

হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে ওই উঁচু কানায় পা লাগিয়া হোঁচট খাইয়াছিল।

আল্‌গা পাথরটা দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম,—'ব্যোমকেশ! পাথরের তলায় তোষাখানার গর্ত নেই তো?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'উঁহু, পাথরটা বড় জোর চৌদ্দ ইঞ্চি চৌকশ। ওর তলায় যদি গর্ত থাকেও, তা দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারবে না।'

'তবু—'

'না হে, যা ভাবছ তা নয়। খোলা উঠোনে তোষাখানার গুপ্তদ্বার হতে পারে না। যা হোক, কাল সকালে পাথর তুলিয়ে দেখতে হবে।'

ব্যোমকেশ টর্চ ঘুরাইয়া চারিদিকে আলো ফেলিল, কিন্তু অন্য কোথাও পাথরের পাটি নাড়াচাড়া হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। অদূরে কামানটা পড়িয়া আছে, তাহার নীচে অনেক ধুলোমাটি জমিয়া কামানকে মেঝের সঙ্গে জাম করিয়া দিয়াছে; সেখানেও আল্‌গা মাটি বা পাথর চোখে পড়িল না।

এই সময় সীতারাম আসিয়া জানাইল, আহার প্রস্তুত। হাতের ঘড়িতে দেখিলাম পৌনে দশটা। কখন যে নিঃসাড়ে সময় কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই।

ঘরে গিয়া আহারে বসিলাম। ইক্‌মিক্‌ কুকারে রাঁধা খিচুড়ি এবং মাংস যে এমন অমৃততুল্য হইতে পারে তাহা জানা ছিল না। তার উপর সীতারাম অমলেট ভাজিয়াছে। গুরুভোজন হইয়া গেল।

আমাদের ভোজন শেষ হইলে সীতারাম বারান্দার নিজের আহার সারিয়া লইল। দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'হুজুর, যদি হুকুম হয়, একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ তো। তুমি শোবে কোথায়?'

সীতারাম বলিল, 'সেজন্যে ভাববেন না হুজুর। আমি দোরের বাইরে বিছানা পেতে শুয়ে থাকব।'

সীতারাম চলিয়া গেল। আমরা আলো কমাইয়া দিয়া বিছানায় লম্বা হইলাম। দ্বার খোলাই রহিল; কারণ ঘরে জানালা নাই, দ্বার বন্ধ করিলে দম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

শুইয়া শুইয়া বোধহয় তন্দ্রা আসিয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশের গলার আওয়াজে সচেতন হইয়া উঠিলাম, 'দ্যাখো, ঐ গজালগুলো আমার ভাল ঠেকছে না।'

'গজাল! কোন্‌ গজাল?'

'দেয়ালে এত গজাল কেন? পাণ্ডেজি একটা কৈফিয়ৎ দিলেন বটে, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।'

এত রাত্রে গজালকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না। ঘড়িতে দেখিলাম এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সীতারাম এখনও এদিক ওদিক দেখিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

'আজ ঘুমোও, কাল গজালের কথা ভেবে।' বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

৬

গভীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ মাথার শিয়রে বোমা ফাটার মত শব্দে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মুহূর্তের জন্য কোথায় আছি ঠাহর করিতে পারিলাম না।

স্থানকালের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম ব্যোমকেশ দ্বারের বাহিরে টর্চের আলো ফেলিয়াছে, সেখানে কতকগুলো ভাঙা হাঁড়ি কলসীর মত খোলামকুচি পড়িয়া আছে। তারপর ব্যোমকেশ, জলন্ত টর্চ হাতে লইয়া তীরবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 'অজিত এসো—'

আমিও আলুথালুভাবে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম; সে কাহারও পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে কিম্বা বিপদের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতের আলোটা যেদিকে যাইতেছে, আমিও সেইদিকে ছুটিলাম।

তোরণের মুখে পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ সিঁড়ির উপর আলো ফেলিল। আমি তাহার কাছে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সিঁড়ি দিয়া একটা লোক ছুটিতে ছুটিতে উপরে আসিতেছে। কাছে আসিলে চিনিলাম—সীতারাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'সীতারাম, সিঁড়ি দিয়ে কাউকে নামতে দেখেছ?'

সীতারাম বলিল, 'জী হুজুর, আমি ওপরে আসছিলাম, হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে টক্কর লেগে গেল। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লোকটা হাত ছাড়িয়ে পালাল।'

'তাকে চিনতে পারলে?'

'জী না, অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাইনি। কিন্তু টক্কর লাগবার সময় তার মুখ দিয়ে একটা বুরা জবান বেরিয়ে গিয়েছিল, তা শুনে মনে হল লোকটা ছোট জাতের হিন্দুস্থানী। —কিন্তু কী হয়েছে হুজুর?'

'তা এখনও ঠিক জানি না। দেখবে এস।'

ফিরিয়া গেলাম। ঘরের সম্মুখে ভাঙা হাঁড়ির টুকরাগুলা পড়িয়া ছিল, ব্যোমকেশ বলিল, 'ঐ দ্যাখো। আমি জেগেছিলাম, বাইরে খুব হাল্কা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভাবলাম, তুমি বুঝি ফিরে এলে। তারপরই দুম্ করে শব্দ—'

সীতারাম ভাঙা সরার মত একটা টুকরা তুলিয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিল। বলিল, 'হুজুর, চট্ করে খাটের ওপর উঠে বসুন।'

'কেন? কি ব্যাপার?'

'সাপ। কেউ সরা-ঢাকা হাঁড়িতে সাপ এনে এইখানে হাঁড়ি আছড়ে ভেঙেছে। আমাকে টর্চ দিন, আমি খুঁজে দেখছি। সাপ কাছেই কোথাও আছে।'

আমরা বিলম্ব না করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিলাম, কারণ অন্ধকার রাত্রে সাপের সঙ্গে বীরত্ব চলে না। সীতারাম টর্চ লইয়া বাহিরে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল।

লণ্ঠনটা উস্কাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুকে কিসের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল এখন বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু লোকটা কে?'

'তা এখন বলা শক্ত। বুলাকিলাল হতে পারে, গণপৎ হতে পারে, এমন কি সন্ন্যাসি ঠাকুরও হতে পারেন।'

এই সময় সীতারামের আকস্মিক অট্টহাস্য শুনিতে পাইলাম। সীতারাম গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'হুজুর, এদিকে দেখবেন আসুন। কোনও ভয় নেই।'

সন্তর্পণে নামিয়া সীতারামের কাছে গেলাম। বাড়ির একটা কোণ আশ্রয় করিয়া বাদামী রঙের একটা সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া কিল্‌বিল করিতেছে। সাপটা আহত, তাই পলাইতে পারিতেছে না, তীব্র আলোর তলায় তাল পাকাইতেছে।

সীতারাম হাসিয়া বলিল, 'ঢাম্‌না সাপ, হুজুর, বিষ নেই। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের সঙ্গে দিল্‌লাগি করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দিল্‌লাগিই বটে। কিন্তু এখন সাপটাকে নিয়ে কি করা যাবে?'

'আমি ব্যবস্থা করছি।' সীতারাম খাবার ঢাকা দিবার ছিদ্রযুক্ত পিতলের ঢাক্‌নি আনিয়া সাপটাকে চাপা দিল, বলিল, 'আজ এমনি থাক, কাল দেখা যাবে।'

আমরা ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সীতারাম দ্বারের সম্মুখে নিজের বিছানা পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সীতারাম, তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে, কি করছিলে, এবার বল দেখি।'

সীতারাম বলিল, 'হুজুর, এখান থেকে নেমে দেউড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি, বুলাকিলাল ভাঙ্ খেয়ে নিজের কুঠুরীর মধ্যে ঘুমুচ্ছে। তার কাছে থেকে কিছু খবর বার করবার ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে দোস্তী করে রেখেছিলাম। ঠেলাঠুলি দিলাম কিন্তু বুলাকিলাল জাগল না। কি করি, ভাবলাম, যাই সাধুবাবার দর্শন করে আসি।

'সাধুবাবা জেগে ছিলেন, আমাকে দেখে খুশী হলেন। আমাকে অনেক সওয়াল করলেন; আপনারা কে, কি জন্যে এসেছেন, এইসব জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনারা হাওয়া বদল করতে এসেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। আর কি কথা হল?'

সীতারাম বলিল, 'অনেক আজে-বাজে কথা হল হুজুর। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একেবারে প্রোফেসার সাহেবের মৃত্যুর কথা তুললাম, তাতে সাধুবাবা ভীষণ চটে উঠলেন। দেখলাম বাড়ির মালিক আর নায়েববাবুর ওপর ভারি রাগ। বার বার বলতে লাগলেন, ওদের সর্বনাশ হবে, ওদের সর্বনাশ হবে।'

'তাই নাকি! ভারি অকৃতজ্ঞ সাধু দেখছি। তারপর?'

'তারপর সাধুবাবা এক ছিলিম গাঁজা চড়ালেন। আমাকে প্রসাদ দিলেন।'

'তুমি গাঁজা খেলে?'

'জী হুজুর। সাধুবাবার প্রসাদ তো ফেলে দেওয়া যায় না।'

'তা বটে। তারপর?'

'তারপর সাধুবাবা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও চলে এলাম। ফেরবার সময় সিঁড়িতে ঐ লোকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, একটা কথা বল তো সীতারাম। তুমি যখন ফিরে আসছিলে তখন বুলাকিলালকে দেখেছিলে?'

সীতারাম বলিল, 'না হুজুর, চোখে দেখিনি। কিন্তু দেউড়ির পাশ দিয়ে আসবার সময় কুঠুরী থেকে তার নাকডাকার ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ শুনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাপের হাঁড়ি নিয়ে যিনি এসেছিলেন তিনি আর যেই হোন, বুলাকিলাল কিম্বা সাধুবাবা নন। আশা করি, তিনি আজ আর দ্বিতীয়বার এদিকে আসবেন না—এবার ঘুমিয়ে পড়।'

সকালে উঠিয়া দেখা গেল ঢাক্‌নি-চাপা সাপটা রাত্রে মরিয়া গিয়াছে; বোধহয় হাঁড়ি ভাঙার সময় গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। সীতারাম সেটাকে লাঠির ডগায় তুলিয়া দুর্গপ্রাকারের বাহিরে ফেলিয়া দিল। আমরাও প্রাকারে উঠিয়া একটা চক্র দিলাম। দেখা গেল, প্রাকার একেবারে অটুট নয় বটে কিন্তু তোরণদ্বার ছাড়া দুর্গে প্রবেশ করিবার অন্য কোনও চোরাপথ নাই। প্রাকারের নীচেই অগাধ গভীরতা।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় সীতারামকে দুর্গে রাখিয়া ব্যোমকেশ ও আমি রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম। রমাপতি সদর বারান্দায় আমাদের অভ্যর্থনা করিল।—'আসুন। কর্তা এখনি বেরুচ্ছেন, শহরে যাবেন।'

'তাই নাকি!' আমরা ইতস্তত করিতেছি এমন সময় রামকিশোরবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে গরদের পাঞ্জাবি, গলায় কোঁচানো চাদর; আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'এই যে!—নতুন জায়গা কেমন লাগছে? রাত্রে বেশ আরামে ছিলেন? কোনও রকম অসুবিধে হয়নি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোন অসুবিধে হয়নি, ভারি আরামে রাত কেটেছে। আপনি বেরুচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, একবার উকিলের বাড়ি যাব, কিছু দলিলপত্তর রেজিস্ট্রি করাতে হবে। তা—আপনারা এসেছেন, আমি না হয় একটু দেরি করেই যাব—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, আপনি কাজে বেরুচ্ছেন বেরিয়ে পড়ুন। আমরা এমনি বেড়াতে এসেছি, কোনও দরকার নেই।'

'তা—আচ্ছা। রমাপতি, এ'দের চা-টা দাও। আমাদের ফিরতে বিকেল হবে।'

রামকিশোর বাহির হইয়া পড়িলেন; জামাই মণিলাল এক বস্তা কাগজপত্র লইয়া সঙ্গে

গেল। আমাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় মণিলাল সহাস্যমুখে নমস্কার করিল।

ব্যোমকেশ রমাপতিকে বলিল, 'চায়ের দরকার নেই, আমরা চা খেয়ে বেরিয়েছি। আজই বুঝি সম্পত্তি বাঁটোয়ারার দলিল রেজিস্ট্রি হবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যাক, একটা দুর্ভাবনা মিটল।—আচ্ছা, বলুন দেখি—'

রমাপতি হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আমাকে 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলুন।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, কিন্তু সে পরে হবে। এখন বল দেখি গণপৎ কোথায়?'

রমাপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'গণপৎ—মুরলীদার চাকর? বাড়িতেই আছে নিশ্চয়। আজ সকালে তাকে দেখিনি। ডেকে আনব?'

এই সময় মুরলীধর বারান্দায় আসিয়া আমাদের দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। তাহার ট্যারা চোখ আরও ট্যারা হইয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই মুরলীধরবাবু? নমস্কার। আপনার চাকর গণপৎকে একবার ডেকে দেবেন? তার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

মুরলীধরের মুখ ভয় ও বিদ্রোহের মিশ্রণে অপরূপ ভাব ধারণ করিল। সে চেরা গলায় বলিল, 'গণপতের সঙ্গে কি দরকার?'

'তাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'সে—তাকে ছুটি দিয়েছি। সে বাড়ি গেছে।'

'তাই নাকি! কবে ছুটি দিয়েছেন?'

'কাল—কাল দুপুরে।' মুরলীধর আর প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। রমাপতির মুখে একটা ত্রস্ত উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। সে ব্যোমকেশের কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'কাল দুপুরে—! কিন্তু কাল সন্ধ্যের পরও আমি গণপৎকে বাড়িতে দেখেছি—'

ঘাড় নাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'খুব সম্ভব। কারণ, রাত বারোটা পর্যন্ত গণপৎ বাড়ি যায়নি। কিন্তু সে যাক। নায়েব চাঁদমোহনবাবু বাড়িতে আছেন নিশ্চয়। আমরা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

রমাপতি বলিল, 'তিনি নিজের ঘরে আছেন—'

'বেশ, সেখানেই আমাদের নিয়ে চল।'

বাড়ির এক কোণে চাঁদমোহনের ঘর। আমরা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া সারি সারি কলিকায় তামাক সাজিয়া রাখিতেছেন বোধ করি সারাদিনের কাজ সকালেই সারিয়া লইতেছেন। ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া রমাপতিকে বিদায় করিল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম, ব্যোমকেশ দরজা ভেজাইয়া দিল।

আমাদের অতর্কিত আবির্ভাবে চাঁদমোহন ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার চতুর চোখে চকিতে ভয়ের ছায়া পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কে? আঁ—ও—আপনারা—!'

ব্যোমকেশ তক্তপোশের কোণে বসিয়া বলিল, 'চাঁদমোহনবাবু, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' তাহার কণ্ঠস্বর খুব মোলায়েম শুনাইল না।

ত্রাসের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া চাঁদমোহন গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'কি কথা?'

'অনেক দিনের পুরোনো কথা। রামবিনোদের মৃত্যু হয় কি করে?'

চাঁদমোহনের মুখ শীর্ণ হইয়া গেল, তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে

বলিলেন, 'আমি কিছু বলতে পারি না—আমি এ বাড়ির নায়েব—'

ব্যোমকেশ গম্ভীর স্বরে বলিল, 'চাঁদমোহনবাবু, আপনি আমার নাম জানেন; আমার কাছে কোনও কথা লুকোবার চেষ্টা করলে তার ফল ভাল হয় না। রামবিনোদের মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। কি করে তাঁর মৃত্যু হল সব কথা খুলে বলুন।'

চাঁদমোহন ব্যোমকেশের দিকে একটা তীক্ষ্ণ চোরা চাহনি হানিয়া ধীরে ধীরে তক্তপোশের একপাশে আসিয়া বসিলেন, শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'আপনি যখন জোর করছেন তখন না বলে আমার উপায় নেই। আমি যতটুকু জানি বলছি।'

ভিজা গামছায় মুখ মুছিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'১৯১১ সালের শীতকালে আমরা মুঙ্গেরে ছিলাম। রামবিনোদ আর রামকিশোরের তখন ঘিয়ের ব্যবসা ছিল, কলকাতায় ঘি চালান দিত। মস্ত ঘিয়ের আড়ৎ ছিল। আমি ছিলাম কর্মচারী, আড়তে বসতাম। ওরা দুই ভাই যাওয়া আসা করত।

'হঠাৎ একদিন মুঙ্গেরে প্লেগ দেখা দিল। মানুষ মরে উড়কুড়ু উঠে যেতে লাগল, যারা বেঁচে রইল তারা ঘর-দোর ফেলে পালাতে লাগল। শহর শূন্য হয়ে গেল। রামবিনোদ আর রামকিশোর তখন মুঙ্গেরে, তারা বড় মুশকিলে পড়ল। আড়তে ষাট-সত্তর হাজার টাকার মাল রয়েছে, ফেলে পালানো যায় না; হয়তো সব চোরে নিয়ে যাবে। আমরা তিনজনে পরামর্শ করে স্থির করলাম, গঙ্গার বুকে নৌকো ভাড়া করে থাকব, আর পালা করে রোজ একজন এসে আড়ৎ তদারক করে যাব। তারপর কপালে যা আছে তাই হবে। একটা সুবিধে ছিল, আড়ৎ গঙ্গা থেকে বেশী দূরে নয়।

'রামবিনোদের এক ছেলেবেলার বন্ধু মুঙ্গেরে স্কুল মাস্টারি করত—ঈশান মজুমদার। ঈশান সেদিন সর্পাঘাতে মারা গেছে। সেও নৌকোয় এসে জুটল। মাঝি মাল্লা নেই, শুধু আমরা চারজন—নৌকোটা বেশ বড় ছিল; নৌকোতেই রান্নাবান্না, নৌকোতেই থাকা। গঙ্গার মাঝখানে চড়া পড়েছিল, কখনও সেখানে গিয়ে রাত কাটাতাম। শহরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কেবল দিনে একবার গিয়ে আড়ৎ দেখে আসা।

'এইভাবে দশ বারো দিন কেটে গেল। তারপর একদিন রামবিনোদকে প্লেগে ধরল। শহরে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে ফিরে এল। আমরা চড়ায় গিয়ে নৌকো লাগালাম, রামবিনোদকে চড়ায় নামালাম। একে তো প্লেগের কোনও চিকিৎসা নেই, তার ওপর মাঝ-গঙ্গায় কোথায় ওষুধ, কোথায় ডাক্তার। রামবিনোদ পরের দিনই মারা গেল।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'তারপর আপনারা কি করলেন?'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'আর থাকতে সাহস হল না। আড়তের মায়া ত্যাগ করে নৌকো ভাসিয়ে ভাগলপুরে পালিয়ে এলাম।'

'রামবিনোদের দেহ সৎকার করেছিলেন?'

চাঁদমোহন গামছায় মুখ মুছিয়া বলিলেন, 'দাহ করবার উপকরণ ছিল না; দেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

'চল, এবার ফেরা যাক। এখানকার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে।'

সিঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি মনে হল? চাঁদমোহন সত্যি কথা বলেছে?'

'একটু মিথ্যে বলেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।'

সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইব, দেখিলাম তুলসী অদূরে একটি গাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়াছে, একাকিনী খেলায় এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছে যে আমাদের লক্ষ্যই করিল না। ব্যোমকেশ কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে বিস্ফারিত চক্ষু তুলিয়া চাহিল। ব্যোমকেশ একটু সস্নেহ হাসিয়া বলিল, 'তোমার নাম তুলসী, না? কি মিষ্টি তোমার মুখখানি।'

তুলসী তেমনি অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা দুর্গে আছি, তুমি আসো না কেন? এসো—অনেক গল্প বলব।'

তুলসী তেমনি তাকাইয়া রহিল, উত্তর দিল না। আমরা চলিয়া আসিলাম।

৭

দুর্গে ফিরিয়া কিছুক্ষণ সিঁড়ি ওঠা-নামার ক্লান্তি দূর করিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু দলিল রেজিস্ট্রি করতে গেলেন। যদি হয়ে যায়, তাহলে ওদের বাড়িতে একটা নাড়াচাড়া তোলাপাড়া হবে; বংশী আর মুরলীধর হয়তো শহরে গিয়ে বাড়ি-ভাড়া করে থাকতে চাইবে। তার আগেই এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার।'

প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝছ? আমি তো যতই দেখছি, ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আবছায়া চলচ্চিত্রের ছবি মনের পর্দায় ফুটে উঠছে। ছবিটা ছোট নয়; অনেক মানুষ অনেক ঘটনা অনেক সংঘাত জড়িয়ে তার রূপ। একশো বছর আগে এই নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল, এখনও শেষ হয়নি।—ভাল কথা, কাল রাত্রের আলগা পাথরটার কথা মনে ছিল না। চল, দেখি গিয়ে তার তলায় গর্ত আছে কিনা।'

'চল।'

পাথরটার উপর অল্প-অল্প চুন সুরকি জমাট হইয়া আছে, আশেপাশের পাথরগুলির মত মসৃণ নয়। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'মনে হচ্ছে পাথরটাকে তুলে আবার উল্টো করে বসানো হয়েছে। এসো, তুলে দেখা যাক।'

আমরা আঙুল দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পাথর উঠিল না। তখন সীতারামকে ডাকা হইল। সীতারাম করিতকর্মা লোক, সে একটা খুন্তি আনিয়া চাড়া দিয়া পাথর তুলিয়া ফেলিল।

পাথরের নীচে গর্তটর্ত কিছু নাই, ভরাট চুন সুরকি। ব্যোমকেশ পাথরের উল্টা পিঠ পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ওহে, এই দ্যাখো, উর্দু-ফারসী লেখা রয়েছে!'

দেখিলাম পাথরের উপর কয়েক পংক্তি বিজাতীয় লিপি খোদাই করা রহিয়াছে। খোদাই খুব গভীর নয়, উপরন্তু লেখার উপর ধুলাবালি জমিয়া প্রায় অলক্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'আমার মনে হচ্ছে—। দাঁড়াও, ঈশানবাবুর খাতাটা নিয়ে আসি।'

ঈশানবাবুর খাতা ব্যোমকেশ নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে তাহা আনিয়া যে-পাতায় ফারসী লেখা ছিল, তাহার সহিত পাথরের উৎকীর্ণ লেখাটা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। আমিও দেখিলাম। অর্থবোধ হইল না বটে, কিন্তু দুটি লেখার টান যে একই রকম তাহা সহজেই চোখে পড়ে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়েছে। এবার চল।'

পাথরটি আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা ঘরে আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার বুঝলে?'

'তুমি পরিষ্কার করে বল।'

'একশ বছর আগের কথা স্মরণ কর। সিপাহীরা আসছে শুনে রাজারাম তাঁর পরিবার-বর্গকে সরিয়ে দিলেন, দুর্গে রইলেন কেবল তিনি আর জয়রাম। তারপর বাপবেটায় সমস্ত ধনরত্ন লুকিয়ে ফেললেন।

'কিন্তু সোনাদানা লুকিয়ে রাখার পর রাজারামের ভয় হল, সিপাহীদের হাতে তাঁরা যদি মারা পড়েন, তাহলে তাঁদের স্ত্রী-পরিবার সম্পত্তি উদ্ধার করবে কি করে? তিনি পাথরের উপর সংকেত-লিপি লিখলেন; এমন ভাষায় লিখলেন যা সকলের আয়ত্ত নয়। তারপর

ধুলোকাদা দিয়ে লেখাটা অস্পষ্ট করে দিলেন, যাতে সহজে সিপাহীদের নজরে না পড়ে

'সিপাহীরা এসে কিছুই খুঁজে পেল না। রাগে তারা বাপবেটাকে হত্যা করে চলে গেল তারপর রাজারামের পরিবারবর্গ যখন ফিরে এল, তারাও খুঁজে পেল না রাজারাম কোথায় তাঁর ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গেছেন। পাথরের পাটিতে খোদাই করা ফারসী সঙ্কেত-লিপি কারুর চোখে পড়ল না।'

বলিলাম, 'তাহলে তোমার বিশ্বাস, রাজারামের ধনরত্ন এখনও দুর্গে লুকোনো আছে।'

'তাই মনে হয়। তবে সিপাহীরা যদি রাজারাম আর জয়রামকে যন্ত্রণা দিয়ে গুপ্তস্থানের সন্ধান বার করে নিয়ে থাকে তাহলে কিছুই নেই।'

'তারপর বল।'

'তারপর একশ বছর পরে এলেন অধ্যাপক ঈশান মজুমদার। ইতিহাসের পণ্ডিত ফারসী-জানা লোক; তার ওপর বন্ধু রামবিনোদের কাছে দুর্গের ইতিবৃত্ত শুনেছিলেন। তিনি সন্ধান করতে আরম্ভ করলেন; প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। তাঁর এই গুপ্ত অনুসন্ধান কতদূর এগিয়েছিল জানি না, কিন্তু একটি জিনিস তিনি পেয়েছিলেন—ঐ পাথরে খোদাই করা সঙ্কেত-লিপি। তিনি সযত্নে তার নকল খাতায় টুকে রেখেছিলেন, আর পাথরটাকে উল্টে বসিয়েছিলেন, যাতে আর কেউ না দেখতে পায়। তারপর—তারপর যে কী হল সেইটেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।'

ব্যোমকেশ খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া রহিল। আমিও আপন মনে এলোমেলো চিন্তা করিতে লাগিলাম। পাণ্ডেজি এবেলা বোধহয় আসিলেন না।...কলিকাতায় সত্যবতীর খবর কি...ব্যোমকেশ হঠাৎ তুলসীর সহিত এমন সস্নেহে কথা বলিল কেন? মেয়েটার চৌদ্দ বছর বয়স, দেখিলে মনে হয় দশ বছরেরটি...

দ্বারের কাছে ছায়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, তুলসী আর গদাধর। তুলসীর চোখে শঙ্কা ও আগ্রহ, বোধহয় একা আসিতে সাহস করে নাই, তাই গদাধরকে সঙ্গে আনিয়াছে গদাধরের কিন্তু লেশমাত্র শঙ্কা-সঙ্কোচ নাই; তাহার হাতে লাট্টু, মুখে কান-এঁটো-করা হাসি। আমাকে দেখিয়া হাস্য সহকারে বলিল, 'হে হে জামাইবাবুর সঙ্গে তুলসীর বিয়ে হবে—হে হে হে—'

তুলসী বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া তাহার গালে একটি চড় বসাইয়া দিল। গদাধর ক্ষণেক গাল ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর গম্ভীরমুখে লাট্টুতে লেত্তি পাকাইতে পাকাইতে প্রস্থান করিল। বুঝিলাম ছোট বোনের হাতে চড়-চাপড় খাইতে সে অভ্যস্ত।

তুলসীকে ব্যোমকেশ আদর করিয়া ঘরের মধ্যে আহ্বান করিল, তুলসী কিন্তু আসিতে চায় না, দ্বারের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যোমকেশ তখন তাহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল।

তবু তুলসীর ভয় ভাঙে না, ব্যাধশঙ্কিতা হরিণীর মত তার ভাবভঙ্গী। ব্যোমকেশ নরম সুরে সমবয়স্কের মত তাহার সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিল। দুটা হাসি তামাসার কথা, মেয়েদের খেলাধুলা পুতুলের বিয়ে প্রভৃতি মজার কাহিনী,—শুনিতে শুনিতে তুলসীর ভয় ভাঙিল। প্রথমে দু' একবার 'হুঁ' 'না', তারপর সহজভাবে কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পনরোর মধ্যে তুলসীর সঙ্গে আমাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। দেখিলাম তাহার মন সরল, বুদ্ধি সতেজ; কেবল তাহার স্নায়ু সুস্থ নয়; সামান্য কারণে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া সহজতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। ব্যোমকেশ তাহার চরিত্র ঠিক ধরিয়াছিল তাই সস্নেহ ব্যবহারে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

তুলসীর সহিত আমাদের যে সকল কথা হইল, তাহা আগাগোড়া পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই, তাহাদের পরিবার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানা গেল যাহা পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাকিগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে এসে যিনি ছিলেন, তোমার বাবার বন্ধু ঈশানবাবু, তাঁর

সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছিল?'

তুলসী বলিল, 'হ্যাঁ। তিনি আমাকে কত গল্প বলতেন। রাত্তিরে তাঁর ঘুম হত না; আমি অনেক বার দুপুর রাত্তিরে এসে তাঁর কাছে গল্প শুনেছি।'

'তাই নাকি! তিনি যে-রাত্তিরে মারা যান সে-রাত্তিরে তুমি কোথায় ছিলে?'

'সে-রাত্তিরে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

'ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল! সে কি!'

'হ্যাঁ। আমি যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই কিনা, তাই ওরা সুবিধে পেলেই আমাকে বন্ধ করে রাখে।'

'ওরা কারা?'

'সবাই। বাবা বড়দা মেজদা জামাইবাবু—'

'সে-রাত্তিরে কে তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল?'

'বাবা।'

'হুঁ। আর কাল রাত্রে বুঝি মেজদা তোমাকে ঘরে বন্ধ করেছিল?'

'হ্যাঁ—তুমি কি করে জানলে?'

'আমি সব জানতে পারি। আচ্ছা, আর একটা কথা বল দেখি। তোমার বড়দার বিয়ে হয়েছিল, বৌদিদিকে মনে আছে?'

'কেন থাকবে না? বৌদিদি খুব সুন্দর ছিল। দিদি তাকে ভারি হিংসে করত।'

'তাই নাকি! তা তোমার বৌদিদি আত্মহত্যা করল কেন?'

'তা জানি না। সে-রাত্তিরে দিদি আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

'ও—'

ব্যোমকেশ আমার সহিত একটা দৃষ্টি বিনিময় করিল। কিছুক্ষণ অন্য কথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা তুলসী, বল দেখি বাড়ির মধ্যে তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসো?'

তুলসী নিঃসঙ্কোচে অলজ্জিত মুখে বলিল, 'মাস্টার মশাইকে। উনিও আমাকে খুব ভালবাসেন।'

'আর মণিলালকে তুমি ভালবাসো না?'

তুলসীর চোখ দুটা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—'না। ও কেন মাস্টার মশাইকে হিংসে করে! ও কেন মাস্টার মশায়ের নামে বাবার কাছে লাগায়? ও যদি আমাকে বিয়ে করে আমি ওকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেব!' বলিয়া তুলসী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা দুই বন্ধু পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বেচারি!'

আধ ঘণ্টা পরে স্নানের জন্য উঠি-উঠি করিতেছি, রমাপতি আসিয়া দ্বারে উঁকি মারিল, কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'তুলসী এদিকে এসেছিল না কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, এই খানিকক্ষণ হল চলে গেছে। এস—বোসো।'

রমাপতি সঙ্কুচিতভাবে আসিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'রমাপতি, প্রথম যেদিন আমরা এখানে আসি, তুমি বলেছিলে এবার ঈশানবাবুর মৃত্যু-সমস্যার সমাধান হবে। অর্থাৎ, তুমি মনে কর ঈশানবাবুর মৃত্যুর একটা সমস্যা আছে। কেমন?'

রমাপতি চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ধরে নেওয়া যাক ঈশানবাবুর মৃত্যুটা রহস্যময়, কেউ তাকে খুন করেছে। এখন আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি তার সোজাসুজি উত্তর দাও। সঙ্কোচ কোরো না। মনে কর তুমি আদালতে হলফ্ নিয়ে সাক্ষী দিচ্ছ।'

রমাপতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়ির সকলকেই তুমি ভাল করে চেনো। বল দেখি, ওদের মধ্যে

এমন কে আছে যে মানুষ খুন করতে পারে?'

রমাপতি সভয়ে কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'আমার বলা উচিত নয়, আমি ওঁদের আশ্রিত। কিন্তু অবস্থায় পড়লে বোধহয় সবাই মানুষ খুন করতে পারেন।'

'সবাই? রামকিশোরবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'বংশীধর?'

'হ্যাঁ।'

'মুরলীধর?'

'হ্যাঁ। ওঁদের প্রকৃতি বড় উগ্র—'

'নায়েব চাঁদমোহন?'

'বোধহয় না। তবে কর্তার হুকুম পেলে লোক লাগিয়ে খুন করাতে পারেন।'

'মণিলাল?'

রমাপতির মুখ অন্ধকার হইল, সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'নিজের হাতে মানুষ খুন করবার সাহস ওঁর নেই। উনি কেবল চুকলি খেয়ে মানুষের অনিষ্ট করতে পারেন।'

'আর তুমি? তুমি মানুষ খুন করতে পার না?'

'আমি—!'

'আচ্ছা, যাক্।—তুমি টর্চ চুরি করেছিলে?'

রমাপতি তিক্তমুখে বলিল, 'আমার বদনাম হয়েছে জানি। কে বদনাম দিয়েছে তাও জানি। কিন্তু আপনিই বলুন, যদি চুরিই করতে হয়, একটা সামান্য টর্চ চুরি করব!'

'অর্থাৎ চুরি করনি।—যাক, মণিলালের সঙ্গে তুলসীর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তুমি জানো?'

রমাপতির মুখ কঠিন হইয়া উঠিল কিন্তু সে সংযতভাবে বলিল, 'জানি। কর্তার তাই ইচ্ছে।'

'আর কারুর ইচ্ছে নয়?'

'না।'

'তোমারও ইচ্ছে নয়?'

রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল,—'আমি একটা গলগ্রহ, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কী আসে যায়। কিন্তু এ বিয়ে যদি হয়, একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে।' বলিয়া আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'ছোকরার সাহস আছে!'

৮

বৈকালে সীতারাম চা লইয়া আসিলে ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'সীতারাম, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। বছর দুই আগে একদল বেদে এসে এখানে তাঁবু ফেলে ছিল। তোমাকে বুলাকিলালের কছে খবর দিতে হবে, বাড়ির কে কে বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত—এ বিষয়ে যত খবর পাও যোগাড় করবে।'

সীতারাম বলিল, 'জি হুজুর। বুলাকিলাল এখন বাবুদের নিয়ে শহরে গেছে, ফিরে এলে খোঁজ নেব।'

সীতারাম প্রস্থান করিলে বলিলাম, 'বেদে সম্বন্ধে কৌতূহল কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষ! সাপের বিষ কোত্থেকে এল খোঁজ নিতে হবে না?'

'ও—'

এই সময় পাণ্ডেজি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাঁধ হইতে চামড়ার ফিতায় বাইনা-

কুলার ঝুলিতেছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'একি; দূরবীন কি হবে?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আনলাম আপনার জন্যে, যদি কাজে লাগে।—সকালে আসতে পারিনি, কাজে আটকে পড়েছিলাম। তাই এবেলা সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় আসতে আসতে দেখি রামকিশোরবাবুও শহর থেকে ফিরছেন। তাঁদের ইঞ্জিন বিগড়েছে, বুলাকিলাল হুইল ধরে বসে আছে, রামকিশোরবাবু গাড়ির মধ্যে বসে আছেন, আর জামাই মণিলাল গাড়ি ঠেলছে।'

'তারপর?'

'দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ি টেনে নিয়ে এলাম।'

'ওঁদের আদালতের কাজকর্ম চুকে গেল?'

'না, একটু বাকি আছে, কাল আবার যাবেন।—তারপর, নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

'অনেক নতুন খবর আছে।'

খবর শুনিতে শুনিতে পাণ্ডেজি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বিবৃতি শেষ হইলে বলিলেন, 'আর সন্দেহ নেই। ঈশানবাবু তোষাখানা খুঁজে বার করেছিলেন, তাই তাঁকে কেউ খুন করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে খুন করতে পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'রামকিশোরবাবু থেকে সন্ন্যিসি ঠাকুর পর্যন্ত সবাই খুন করতে পারে। কিন্তু এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। আরও প্রশ্ন আছে।'

'যেমন?'

'যেমন, বিষ এল কোত্থেকে। সাপের বিষ তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। তারপর ধরুন, সাপের বিষ শরীরে ঢোকাবার জন্যে এমন একটা যন্ত্র চাই যেটা ঠিক সাপের দাঁতের মত দাগ রেখে যায়।'

'হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ—'

'ইন্‌জেকশানের ছুঁচের দাগ খুব ছোট হয়, দু'চার মিনিটের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। আপনি ঈশানবাবুর পায়ে দাগ দেখেছেন, ইন্‌জেকশানের দাগ বলে মনে হয় কি?'

'উহুঁ। তাছাড়া, দুটো দাগ পাশাপাশি—'

'ওটা কিছু নয়। যেখানে রুগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সেখানে পাশাপাশি দু'বার ছুঁচ ফোটানো শক্ত কি?'

'তা বটে।—আর কি প্রশ্ন?'

'আর, ঈশানবাবু যদি গুপ্ত তোষাখানা খুঁজে বার করে থাকেন তবে সে তোষাখানা কোথায়?'

'এই দুর্গের মধ্যেই নিশ্চয় আছে।'

'শুধু দুর্গের মধ্যেই নয়, এই বাড়ির মধ্যেই আছে। মুরলীধর যে সাপের ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে, তার কারণ কি?'

পাণ্ডেজি তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিলেন, 'মুরলীধর?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মোট কথা, ঈশানবাবু আসবার আগে তোষাখানার সন্ধান কেউ জানত না। তারপর ঈশানবাবু ছাড়া আর একজন জানতে পেরেছে এবং ঈশানবাবুকে খুন করেছে। তবে আমার বিশ্বাস, মাল সরাতে পারেনি।'

'কি করে বুঝলেন?'

'দেখুন, আমরা দুর্গে আছি, এটা কারুর পছন্দ নয়। এর অর্থ কি?'

'বুঝেছি। তাহলে আগে তোষাখানা খুঁজে বার করা দরকার। কোথায় তোষাখানা থাকতে পারে; আপনি কিছু ভেবে দেখেছেন কি?'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, বলিল, 'কাল থেকে একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে ঘুরছে—'

আমি বলিলাম, 'গজাল!'

এই সময় সীতারাম চায়ের পাত্রগুলি সরাইয়া লইতে আসিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বুলাকিলাল ফিরে এসেছে!'

সীতারাম মাথা ঝুঁকাইয়া পাত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওকে কোথাও পাঠালেন নাকি?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলালের কাছে কিছু দরকার আছে।'

'যাক। এবার আপনার সন্দেহের কথা বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঐ গজালগুলো। কেবল সন্দেহ হচ্ছে ওদের প্রকাশ্য প্রয়োজনটাই একমাত্র প্রয়োজন নয়, যাকে বলে ধোঁকার টাটি, ওরা হচ্ছে তাই।'

পাণ্ডে গজালগুলিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'হুঁ। তা কি করা যেতে পারে।'

'আমার ইচ্ছে ওদের একটু নেড়েচেড়ে দেখা। আপনি এসেছেন, আপনার সামনেই যা কিছু করা ভাল। যদি তোষাখানা বেরোয়, আমরা তিনজনে জানব, আর কাউকে আপাতত জানতে দেওয়া হবে না।—অজিত, দরজা বন্ধ কর।'

দরজা বন্ধ করিলে ঘর অন্ধকার হইল। তখন লণ্ঠন জ্বালিয়া এবং টর্চের আলো ফেলিয়া আমরা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। সর্বসুদ্ধ পনরোটি গজাল। আমরা প্রত্যেকটি টানিয়া ঠেলিয়া উঁচু দিকে আকর্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গজালগুলি মরিচা-ধরা কিন্তু বজ্রের মত দৃঢ়, একচুলও নড়িল না।

হঠাৎ পাণ্ডে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে! নড়ছে—একটু একটু নড়ছে—!' আমরা ছুটিয়া তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দরজার সামনে যে দেয়াল, তাহার মাঝখানে একটা গজাল। পাণ্ডে গজাল ধরিয়া ভিতর দিকে ঠেলা দিতেছেন; নড়িতেছে কিনা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার একার কর্ম নয়। ব্যোমকেশবাবু, আপনিও ঠেলুন।'

ব্যোমকেশ হাঁটু গাড়িয়া দুই হাতে পাথরে ঠেলা দিতে শুরু করিল। চতুষ্কোণ পাথর ধীরে ধীরে পিছন দিকে সরিতে লাগিল। তাহার নীচে অন্ধকার গর্ত দেখা গেল।

আমি টর্চের আলো ফেলিলাম। গর্তটি লম্বা-চওড়ায় দুই হাত, ভিতরে একপ্রস্থ সরু সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে।

পাণ্ডে মহা উত্তেজিতভাবে কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, 'সাবাস! পাওয়া গেছে তোষাখানা।—ব্যোমকেশবাবু, আপনি আবিষ্কর্তা, আপনি আগে ঢুকুন।'

টর্চ লইয়া ব্যোমকেশ আগে নামিল, তারপর পাণ্ডেজি, সর্বশেষে লণ্ঠন লইয়া আমি। ঘরটি উপরের ঘরের মতই প্রশস্ত। একটি দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া সারি সারি মাটির কুণ্ডা কুণ্ডার মুখে ছোট ছোট হাঁড়ি, হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ঢাকা। ঘরের অন্য কোণে একটি বড় উনান, তাহার সহিত একটি হাপরের নল সংযুক্ত রহিয়াছে। হাপরের চামড়া অবশ্য শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঠামো দেখিয়া হাপর বলিয়া চেনা যায়। ঘরে আর কিছু নাই।

আমাদের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল, পেট মোটা কুণ্ডাগুলিতে না জানি কোন্ রাজার সম্পত্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু আগে ঘরের অন্যান্য স্থান দেখা দরকার। এদিক-ওদিক আলো ফেলিতে এককোণে একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়িল। ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখি—একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ। তুলিয়া লইয়া জ্বালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু টর্চ জ্বালাই ছিল, জ্বলিয়া জ্বলিয়া সেল্ ফুরাইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবু যে এ ঘরের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ।'

তখন আমরা হাঁড়িগুলি খুলিয়া দেখিলাম। সব হাঁড়িই শূন্য, কেবল একটা হাঁড়ির তলায় নুনের মত খানিকটা গুঁড়া পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ একখামচা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল, তারপর রুমালে বাঁধিয়া পকেটে রাখিল। বলিল, 'নুন হতে পারে, চুণ হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে।'

অতঃপর কুণ্ডাগুলি একে একে পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু হায়, সাত রাজার ধন মিলিল না। সব কুণ্ডা খালি, কোথাও একটা কপর্দক পর্যন্ত নাই।

আমরা ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম। তারপর ঘরটিতে আঁতিপাঁতি করা হইল, কিন্তু কিছু মিলিল না।

উপরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে গুপ্তদ্বার টানিয়া বন্ধ করা হইল। তারপর ঘরের দরজা খুলিলাম। বাহিরে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; সীতারাম দ্বারের বাহিরে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। ব্যোমকেশ ক্লান্তস্বরে বলিল, 'সীতারাম, আর একদফা চা তৈরি কর।'

চেয়ার লইয়া তিনজনে বাহিরে বসিলাম। পাণ্ডে দমিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, 'কি হল বলুন দেখি? মাল গেল কোথায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনটে সম্ভাবনা রয়েছে। এক, সিপাহীরা সব লুটে নিয়ে গিয়েছে। দুই, ঈশানবাবুকে যে খুন করেছে, সে সেই রাত্রেই মাল সরিয়েছে। তিন, রাজারাম অন্য কোথাও মাল লুকিয়েছেন।'

'কোন্ সম্ভাবনাটা আপনার বেশী মনে লাগে?'

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া 'বলাকা' কবিতার শেষ পংক্তি আবৃত্তি করিল, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বুলাকিলালের দেখা পেলে?'

সীতারাম বলিল, 'জী। গাড়ির ইঞ্জিন মেরামত করছিল, দু-চারটে কথা হল।'

'কি বললে সে?'

'হুজুর, বুলাকিলাল একটা আস্ত বুদ্ধু। সন্ধ্যে হলেই ভাঙ খেয়ে বেদম ঘুমোয়, রাত্তিরের কোনও খবরই রাখে না। তবে দিনের বেলা বাড়ির সকলেই বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত। এমনকি, বুলাকিলালও দু-চারবার গিয়েছিল।'

'বুলাকিলাল গিয়েছিল কেন?'

'হাত দেখাতে। বেদেনীরা নাকি ভাল হাত দেখতে জানে, ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। বুলাকিলালকে বলেছে ও শীগ্‌গির লাট সাহেবের মোটর ড্রাইভার হবে।'

'বাড়ির আর কে কে যেতো?'

'মালিক মালিকের দুই বড় ছেলে, জামাইবাবু, নায়েববাবু, সবাই যেতো। আর ছোট ছেলেমেয়ে দুটো সর্বদাই ওখানে ঘোরাঘুরি করত।'

'হুঁ, আর কিছু?'

'আর কিছু নয় হুজুর।'

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া পাণ্ডেজি উঠিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে রুমালে বাঁধা পুঁটুলি দিয়া বলিল, 'এটার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ করিয়ে দেখবেন। আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু খবর সংগ্রহ করেছি তাতে নিরাশ হবার কিছু নেই। অন্তত ঈশানবাবুকে যে হত্যা করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, বাকি খবর ক্রমে পাওয়া যাবে।'

পাণ্ডেজি রুমালের পুঁটুলি পকেটে রাখিতে গিয়া বলিলেন, 'আরে, ডাকে আপনার একটা চিঠি এসেছিল, সেটা এতক্ষণ দিতেই ভুলে গেছি। এই নিন।—আচ্ছা, কাল আবার আসব।'

পাণ্ডেজিকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ চিঠি খুলিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্যবতীর চিঠি নাকি?'

'না, সুকুমারের চিঠি।'

'কি খবর?'

'নতুন খবর কিছু নেই। তবে সব ভাল।'

৯

রাত্রিটা নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল।

পরদিন সকালে ব্যোমকেশ ঈশানবাবুর খাতা লইয়া বসিল। কখনও খাতাটা পড়িতেছে,

কখনও ঊর্ধ্বপানে চোখ তুলিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়িতেছে, কথাবার্তা বলিতেছে না।

বাইনাকুলার কাল পাশ্ডেজি রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলাম, 'কিসের গবেষণা হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে বলিল, 'মোহনলাল।'

মোহনলালের নামে আজ, কেন জানি না, বহুদিন পূর্বে পঠিত 'পলাশীর যুদ্ধ' মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম, 'আবার আবার সেই কামান গর্জন...কাঁপাইয়া গঙ্গাজল—'

ব্যোমকেশ ভর্ৎসনা-ভরা চক্ষু তুলিয়া আমার পানে চাহিল। আমি বলিলাম, 'দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন, গর্জিল মোহনলাল নিকট শমন।'

ব্যোমকেশের চোখের ভর্ৎসনা ক্রমে হিংস্র ভাব ধারণ করিতেছে দেখিয়া আমি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। কেহ যদি বীররসাত্মক কাব্য সহ্য করিতে না পারে, তাহার উপর জুলুম করা উচিত নয়।

বাহিরে স্বর্ণোজ্জ্বল হৈমন্ত প্রভাত। দূরবীনটা হাতেই ছিল, আমি সেটা লইয়া প্রাকারে উঠিলাম। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরের পর্বতচূড়া কাছে আসিয়াছে, বনানীর মাথার উপর আলোর ঢেউ খেলিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ির খুঁটিনাটি সমস্ত দেখিতে পাইতেছি। রামকিশোর শহরে যাইবার জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে দুই পুত্র এবং জামাই। তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে মোটর চলিয়া গেল।...বাড়িতে রহিল মাস্টার রমাপতি, গদাধর আর তুলসী।

ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ তখনও জলপানরত মুরগীর মত একবার কোলের দিকে ঝুঁকিয়া খাতা পড়িতেছে, আবার উঁচু দিকে মুখ তুলিয়া আপন মনে বিজ্ বিজ্ করিতেছে। বলিলাম, 'ওহে, রামকিশোরবাবুরা শহরে চলে গেলেন।'

ব্যোমকেশ আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মুরগীর মত জল পান করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বলিল, 'মোহনলাল মস্ত বীর ছিল—না?'

'সেই রকম তো শুনতে পাই।'

ব্যোমকেশ আর কথা কহিল না। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, সে আজ খাতা ছাড়িয়া উঠিবে না। সকালবেলাটা নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটিয়া যাইবে ভাবিয়া বলিলাম, 'চল না, সাধু-দর্শন করা যাক। তিনি হয়তো হাত গুণতে জানেন।'

অনামনস্কভাবে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়, ওবেলা দেখা যাবে।'

দুপুরবেলা শয্যায় শুইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। রামকিশোরবাবু ঠিক বলিয়াছিলেন; এই নির্জনে দু'দিন বাস করিলে প্রাণ পালাই-পালাই করে।

পৌনে তিনটা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া আর পারা গেল না, উঠিয়া পড়িলাম। দেখি, ব্যোমকেশ ঘরে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সে প্রাকারের উপর উঠিয়া পায়চারি করিতেছে। রৌদ্র তেমন কড়া নয় বটে, কিন্তু এ সময় প্রাকারের উপর বায়ু সেবনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না। তবু হয়তো নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়াছে ভাবিয়া আমিও সেই দিকে চলিলাম।

আমাকে দেখিয়া সে যেন নিজের মনের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল, যন্ত্রবৎ বলিল, 'একটা তুরপুন চাই।'

'তুরপুন!' দেখিলাম, তাহার চোখে অধীর বিভ্রান্ত দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি আমার অপরিচিত নয়, সে কিছু পাইয়াছে। বলিলাম, 'কি পেলে?'

ব্যোমকেশ এবার সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল, ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, 'না না, কিছু না। তুমি দিব্যি ঘুমুচ্ছিলে, ভাবলাম এখানে এসে দূরবীনের সাহায্যে নিসর্গ-শোভা নিরীক্ষণ করি। তা দেখবার কিছু নেই।—এই নাও, তুমি দ্যাখো।'

প্রাকারের আলিসার উপর দূরবীনটা রাখা ছিল, সেটা আমাকে ধরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ

নামিয়া গেল। আমি একটু অবাক হইলাম। ব্যোমকেশের আজ এ কী ভাব!

চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। আতপ্ত বাতাসে বহিঃপ্রকৃতি ঝিম ঝিম করিতেছে। দূরবীন চোখে দিলাম; দূরবীন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির উপর স্থির হইল।

দূরবীন দিয়া দেখার সহিত আড়ি পাতার একটা সাদৃশ্য আছে; এ যেন চোখ দিয়া আড়ি পাতা। রামকিশোরবাবুর বাড়িটা দূরবীনের ভিতর দিয়া আমার দশ হাতের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে; বাড়ির সবই আমি দেখিতে পাইতেছি, অথচ আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না।

বাড়ির সদরে কেহ নাই, কিন্তু দরজা খোলা। দূরবীন উপরে উঠিল। হাঁটু পর্যন্ত আলিসা-ঘেরা ছাদ, সিঁড়ি পিছন দিকে। রমাপতি আলিসার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশের ভাগ দেখিতে পাইতেছি। ছাদে আর কেহ নাই; রমাপতি কপাল কুঁচকাইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

রমাপতি চমকিয়া মুখ তুলিল। সিঁড়ি দিয়া তুলসী উঠিয়া আসিল, তাহার মুখে-চোখে গোপনতার উত্তেজনা। লঘু দ্রুতপদে রমাপতির কাছে আসিয়া সে আঁচলের ভিতর হইতে ডান হাত বাহির করিয়া দেখাইল। হাতে কি একটা রহিয়াছে, কালো রঙের পেন্সিল কিম্বা ফাউণ্টেন পেন।

দূরবীনের ভিতর দিয়া দেখিতেছি, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইতেছি না; যেন সে-কালের নির্বাক চলচ্চিত্র। রমাপতি উত্তেজিত হইয়া কি বলিতেছে, হাত নাড়িতেছে। তুলসী তাহার গলা জড়াইয়া অনুনয় করিতেছে, কালো জিনিসটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় রঙ্গমঞ্চে আরও কয়েকটি অভিনেতার আবির্ভাব হইল। রামকিশোরবাবু সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে বংশীধর ও মুরলীধর; সর্বশেষে মণিলাল।

সকলেই ক্রুদ্ধ; রমাপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাঠ হইয়া রহিল। বংশীধর বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া তুলসীকে তাড়না করিল এবং কালো জিনিসটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তুলসী কিছুক্ষণ সতেজ তর্ক করিল, তারপর কাঁদো-কাঁদো মুখে নামিয়া গেল। তখন রমাপতিকে ঘিরিয়া বাকি কয়জন তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন, কেবল মণিলাল কটমট চক্ষে চাহিয়া অধরোষ্ঠ সম্বদ্ধ করিয়া রাখিল।

বংশীধর সহসা রমাপতির গালে একটা চড় মারিল। রামকিশোর বাধা দিলেন, তারপর আদেশের ভঙ্গীতে সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। সকলে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

এই বিচিত্র দৃশ্যের অর্থ কি, সংলাপের অভাবে তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। আমি আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু নাটকীয় ব্যাপার আর কিছু দেখিতে পাইলাম না; যাহা কিছু ঘটিল বাড়ির মধ্যে আমার চক্ষুর অন্তরালে ঘটিল।

নামিয়া আসিয়া ব্যোমকেশকে বলিলাম। সে গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবুরা তাহলে সদর থেকে ফিরে এসেছেন।—তুলসীর হাতে জিনিসটা চিনতে পারলে না?'

'মনে হল ফাউণ্টেন পেন।'

'দেখা যাক, হয়তো শীগ্‌গিরই খবর পাওয়া যাবে। রমাপতি আসতে পারে।'

রমাপতি আসিল না, আসিল তুলসী। ঝড়ের আগে শুষ্ক পাতার মত সে যেন উড়িতে উড়িতে আসিয়া আমাদের ঘরের চৌকাঠে আটকাইয়া গেল। তাহার মূর্তি পাগলিনীর মত, দুই চক্ষু রাঙা টকটক করিতেছে। সে খাটের উপর ব্যোমকেশকে উপবিষ্ট দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলের উপর আছড়াইয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমার মাস্টার মশাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে?'

তুলসীর কান্না থামানো সহজ হইল না। যাহোক, ব্যোমকেশের সস্নেহ সান্ত্বনায় কান্না ক্রমে ফোঁপানিতে নামিল, তখন প্রকৃত তথ্য জানা গেল।

জামাইবাবুর দুইটি ফাউন্টেন পেন আছে; একটি তাঁহার নিজের, অন্যটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুক পাইয়াছিলেন...জামাইবাবু দুইটি কলম লইয়া কি করিবেন? তাই আজ তুলসী জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার দেরাজ হইতে কলম লইয়া মাস্টার মশাইকে দিতে গিয়াছিল—মাস্টার মশায়ের একটিও কলম নাই—মাস্টার মশাই কিন্তু লইতে চান নাই, রাগ করিয়া কলম যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে হুকুম দিয়াছিলেন, এমন সময় বাড়ির সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাস্টার মশাইকে চোর বলিয়া ধরিল...তুলসী এত বলিল মাস্টার মশাই চুরি করেন নাই কিন্তু কেহ শুনিল না। শেষ পর্যন্ত মারধর করিয়া মাস্টার মশাইকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

আমি দূরবীনের ভিতর দিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহার সহিত তুলসীর কাহিনীর কোথাও গরমিল নাই। আমরা দুইজনে মিলিয়া তুলসীকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম, মাস্টার আবার ফিরিয়া আসিবে, কোনও ভাবনা নাই; প্রয়োজন হইলে আমরা গিয়া তুলসীর বাবাকে বলিব।

দ্বারের কাছে গলা খাঁকারির শব্দ শুনিয়া চকিতে ফিরিয়া দেখি, জামাই মণিলাল দাঁড়াইয়া আছে। তুলসী তাহাকে দেখিয়া তীরের মত তাহার পাশ কাটাইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন মণিবাবু।'

মণিলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'কর্তা পাঠিয়েছিলেন তুলসীর খোঁজ নেবার জন্যে। ও ভারি দুরন্ত, আপনাদের বেশী বিরক্ত করে না তো?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোটেই বিরক্ত করে না। ওর মাস্টারকে নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই বলতে এসেছিল।'

মণিলাল একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বলিল, 'হ্যাঁ, রমাপতিকে কর্তা বিদেয় করে দিলেন। আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না, পরচাবি দিয়ে আমার দেরাজ খুলে একটা কলম চুরি করেছিল। দামী কলম—'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, 'যে কলমটা আপনার বুক পকেটে রয়েছে ঐটে কি?'

'হ্যাঁ।' মণিলাল কলম ব্যোমকেশের হাতে দিল।

পার্কারের কলম, দামী জিনিস। ব্যোমকেশ কলম ভালবাসে, সে তাহার মাথার ক্যাপ খুলিয়া দেখিল, পিছন খুলিয়া কালি ভরিবার যন্ত্র দেখিল; তারপর কলম ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ভাল কলম। চুরি করতে হলে এই রকম কলমই চুরি করা উচিত। বাড়িতে আর কার ফাউন্টেন পেন আছে?'

মণিলাল বলিল, 'আর কারুর নেই। বাড়িতে পড়ালেখার বিশেষ রেওয়াজ নেই। কেবল কর্তা দোয়াত কলমে লেখেন।'

'হুঁ। তুলসী বলছে ও নিজেই আপনার দেরাজ থেকে কলম বার করেছিল—'

মণিলাল দুঃখিত ভাবে বলিল, 'তুলসী মিথ্যে কথা বলছে। রমাপতির ও দোষ বরাবরই আছে। এই সেদিন একটা ইলেক্‌ট্রিক টর্চ—'

আমি বলিতে গেলাম, 'ইলেকট্রিক টর্চ তো—'

কিন্তু আমি কথা শেষ করিবার পূর্বে ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'ইলেকট্রিক টর্চ একটা তুচ্ছ জিনিস। রমাপতি হাজার হোক বুদ্ধিমান লোক, সে কি একটা টর্চ চুরি করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে?'

মণিলাল কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনার কথায় আমার ধোঁকা লাগছে, কি জানি যদি সে টর্চ না চুরি করে থাকে। কিন্তু আজ আমার কলমটা—। তবে কি তুলসী সত্যিই—!'

আমি জোর দিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, তুলসী সত্যি কথা বলেছে। আমি—'

ব্যোমকেশ আবার আমার মুখে থাবা দিয়া বলিল, 'মণিলালবাবু, আপনাদের পারি-

বারিক ব্যাপারে আমাদের মাথা গলানো উচিত নয়। আমরা দু' দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, কি দরকার আমাদের ওসব কথায়! আপনারা যা ভাল বুঝেছেন করেছেন।'

'তাহলেও—কারুর নামে মিথ্যে বদনাম দেওয়া ভাল নয়—' বলিতে বলিতে মণিলাল দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আপনাদের সদরের কাজ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, সকাল সকাল কাজ হয়ে গেল। কেবল দস্তখৎ করা বাকি ছিল।'

'যাক, এখন তাহলে নিশ্চিন্ত।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মণিলাল প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ দরজায় উঁকি মারিয়া আসিয়া বলিল, 'আর একটু হলেই দিয়েছিলে সব ফাঁসিয়ে!'

'সে কি! কী ফাঁসিয়ে দিয়েছিলাম!'

'প্রথমে তুমি বলতে যাচ্ছিলে যে হারানো টর্চ পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর বলতে যাচ্ছিলে যে দূরবীন দিয়ে ছাদের দৃশ্য দেখেছ!'

'হ্যাঁ, তাতে কী ক্ষতি হত?'

'মণিলালকে কোনও কথা বলা মানেই বাড়ির সকলকে বলা। গর্দভচর্মাবৃত যে সিংহটিকে আমরা খুঁজছি সে জানতে পারত যে আমরা তোষাখানার সন্ধান পেয়েছি এবং দূরবীন দিয়ে ওদের ওপর অষ্টপ্রহর নজর রেখেছি। শিকার ভড়কে যেত না?'

এ কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই।

এই সময় সীতারাম চা লইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডেজি আসিলেন। তিনি আমাদের জন্য অনেক তাজা খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছেন। সীতারাম সেগুলো মোটর হইতে আনিতে গেল। আমরা চা পান করিতে করিতে সংবাদের আদান-প্রদান করিলাম।

আমাদের সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডেজি বলিলেন, 'জাল থেকে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ রমাপতি গিয়েছে, কাল বংশীধর আর মুরলীধর যাবে। তাড়াতাড়ি জাল গুটিয়ে ফেলা দরকার।—হ্যাঁ, বংশীধর কলেজ হোস্টেলে থাকতে যে কুকীর্তি করেছিল তার খবর পাওয়া গেছে।'

'কি কুকীর্তি করেছিল?'

'একটি ছেলের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়, তারপর মিটমাট হয়ে যায়। বংশীধর কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল; দোলের দিন সিদ্ধির সঙ্গে ছেলেটাকে ধুতরোর বিচি খাইয়ে দিয়েছিল। ছেলেটা মরেই যেত, অতি কষ্টে বেঁচে গেল।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'হুঁ। তাহলে বিষ প্রয়োগের অভ্যাস বংশীধরের আছে।'

'তা আছে। শুধু গোঁয়ার নয়, রাগ পুষে রাখে।'

পাঁচটা বাজিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসা যাক।'

১০

দেউড়ি পর্যন্ত নামিবার পর দেখিলাম বাড়ির দিকের সিঁড়ি দিয়া বংশীধর গট্‌গট্‌ করিয়া নামিয়া আসিতেছে। আমাদের দেখিতে পাইয়া তাহার সতেজ গতিভঙ্গী কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল; কিন্তু সে থামিল না, যেন শহরের রাস্তা ধরিবে এমনিভাবে আমাদের পিছনে রাখিয়া আগাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ চুপি চুপি বলিল, 'বংশীধর সাধুবাবার কাছে যাচ্ছিল, আমাদের দেখে ভড়কে

গিয়ে অন্য পথ ধরেছে।'

বংশীধর তখনও বেশী দূর যায় নাই, পাণ্ডেজি হাঁক দিলেন, 'বংশীধরবাবু!'

বংশীধর ফিরিয়া ভ্রূ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা কাছে গেলাম, পাণ্ডেজি কৌতুকের সুরে বলিলেন, 'কোথায় চলেছেন হনুহনিয়ে?'

বংশীধর রুক্ষ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'বেড়াতে যাচ্ছি।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া বলিলেন, 'এই তো শহর বেড়িয়ে এলেন। আরও বেড়াবেন?'

বংশীধরের রগের শিরা উঁচু হইয়া উঠিল, সে উদ্ধতস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, বেড়াবো। আপনি পুলিস হতে পারেন, কিন্তু আমার বেড়ানো রুকতে পারেন না।'

পাণ্ডেজিরও মুখ কঠিন হইল। তিনি কড়া সুরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, পারি। কলেজ হোস্টেলে আপনি একজনকে বিষ খাইয়েছিলেন, সে মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ফৌজদারী মামলার তামাদি হয় না। আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি।'

ভয়ে বংশীধরের মুখ নীল হইয়া গেল। উগ্রতা এত দ্রুত আতঙ্কে পরিবর্তিত হইতে পারে চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। সে জালবদ্ধ পশুর ন্যায় ক্ষিপ্রচক্ষে এদিক ওদিক চাহিল, তারপর যে পথে আসিয়াছিল সেই সিঁড়ি দিয়া পলকের মধ্যে বাড়ির দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাণ্ডেজি মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন।

'বংশীধরের বিক্রম বোঝা গেছে।—চলুন।'

সাধুবাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। চারিদিকের ঝাঁকড়া গাছ স্থানটিকে প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। জ্বলন্ত ধুনির সম্মুখে বাবাজী বসিয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া নীরব অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ হাস্যে তাঁহার মুখ ভরিয়া উঠিল, তিনি হাতের ইশারায় আমাদের বসিতে বলিলেন।

পাণ্ডেজী তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দীতেই কথাবার্তা হইল। পাণ্ডেজির গায়ে পুলিসের খাকি কামিজ ছিল, সাধুবাবা তাঁহার সহিত সমধিক আগ্রহে কথা বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে কথা হইল। সন্ন্যাস জীবনের মাহাত্ম্য এবং গার্হস্থ্য জীবনের পঙ্কিলতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত হইলাম। হৃষ্ট বাবাজী ঝুলি হইতে গাঁজা বাহির করিয়া সাজিবার উপক্রম করিলেন।

পাণ্ডেজি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে গাঁজা কোথায় পান বাবা?'

বাবাজী ঊর্ধ্বে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, 'পরমাৎমা মিলিয়ে দেন বেটা।'

চিমটা দিয়া ধুনি হইতে একখণ্ড অঙ্গার তুলিয়া বাবাজী কলিকার মাথায় রাখিলেন। এই সময় তাঁহার চিমটাটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। সাধুরা যে নির্ভয়ে বনে-বাদাড়ে বাস করেন তাহা নিতান্ত নিরস্ত্রভাবে নয়। চিমটা ভালভাবে ব্যবহার করিতে জানিলে ইহার দ্বারা বোধ করি বাঘ মারা যায়। আবার তাহার সূচাগ্রতীক্ষ্ণ প্রান্ত দুটির সাহায্যে ক্ষুদ্র অঙ্গার খণ্ডও যে তুলিয়া লওয়া যায় তাহা তো স্বচক্ষেই দেখিলাম। সাধুরা এই একটি মাত্র লৌহাস্ত্র দিয়া নানা কার্য সাধন করিয়া থাকেন।

যাহোক, বাবাজী গাঁজার কলিকায় দম দিলেন। তাঁহার গ্রীবা এবং রগের শিরা-উপশিরা ফুলিয়া উঠিল। দীর্ঘ একমিনিটব্যাপী দম দিয়া বাবাজী নিঃশেষিত কলিকাটি উপুড় করিয়া দিলেন।

তারপর ধোঁয়া ছাড়িবার পালা। এ কার্যটি বাবাজী প্রায় তিন মিনিট ধরিয়া করিলেন; দাড়ি-গোঁফের ভিতর হইতে মন্দ মন্দ ধূম বাহির হইয়া বাতাসকে সুরভিত করিয়া তুলিল।

বাবাজী বলিলেন, 'বম্! বম্ শঙ্কর!'

এই সময় পায়ের শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, একটি লোক আসিতেছে। লোকটি আমাদের দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন চিনিলাম, রামকিশোরবাবু! তিনি আমাদের চিনিতে পারিয়া স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'ও—আপনারা—!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন।'

রামকিশোর ঈষৎ নিরাশ কণ্ঠে বলিলেন, 'না, আপনারা সাধুজীর সঙ্গে কথা বলছেন বলুন। আমি কেবল দর্শন করতে এসেছিলাম।' জোড়হস্তে সাধুকে প্রণাম করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সাধুর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখে সেই বিচিত্র হাসি। হাসিটিকে বিশ্লেষণ করিলে কতখানি আধ্যাত্মিকতা এবং কতখানি নষ্টামি পাওয়া যায় তাহা বলা শক্ত। সম্ভবতঃ সমান সমান।

এইবার ব্যোমকেশ বলিল, 'সাধুবাবা, আপনি তো অনেকদিন এখানে আছেন। সেদিন একটি লোক এখানে সর্পাঘাতে মারা গেছে, জানেন কি?'

সাধু বলিলেন, 'জান্‌তা হ্যায়। হম্‌ ক্যা নহি জানতা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, সে রাত্রে কেউ দুর্গে গিয়েছিল কি না আপনি দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, দেখা।'

বাবাজীর মুখে আবার সেই আধ্যাত্মিক নষ্টামিভরা হাসি দেখা দিল। ব্যোমকেশ সাগ্রহে আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, আবার পিছন দিকে পায়ের শব্দ হইল। আমরা ঘাড় ফিরাইলাম, বাবাজীও প্রখর চক্ষে সেই দিকে চাহিলেন। কিন্তু আগন্তুক কেহ আসিল না; হয়তো আমাদের উপস্থিতি জানিতে পারিয়া দূর হইতেই ফিরিয়া গেল।

ব্যোমকেশ আবার বাবাজীকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলে তিনি ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, 'এখন নয়। রাত বারোটার সময় এসো, তখন বলব।'

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ব্যোমকেশ কিন্তু চট করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'আচ্ছা বাবা, তাই আসব। ওঠ অজিত।'

বৃক্ষ-বাটিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ ও পাণ্ডেজি চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সন্দেহভাজন কাহাকেও দেখা গেল না।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমি আজ এখান থেকেই ফিরি। রাত বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারলে হত। কিন্তু উপায় নেই। কাল সকালেই আসব।'

পাণ্ডেজি চলিয়া গেলেন।

দুর্গে ফিরিতে ফিরিতে প্রশ্ন করিলাম, 'সাধুবাবা বাঙালী?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সাক্ষাৎ বাঙালী।'

দুর্গে ফিরিয়া ঘড়ি দেখিলাম, সাতটা বাজিয়াছে। মুক্ত আকাশের তলে চেয়ার পাতিয়া বসিলাম।

সাধুবাবা নিশ্চয় কিছু জানে। কী জানে? সে রাত্রে ঈশানবাবুর হত্যাকারীকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল? বৃক্ষ-বাটিকা হইতে দুর্গে উঠিবার সিঁড়ি দেখা যায় না; বিশেষতঃ অন্ধকার রাত্রে। তবে কি সাধুবাবা গভীর রাত্রে সিঁড়ির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়? .....তাহার চিমটা কিন্তু সামান্য অস্ত্র নয়—ঐ চিমটার আগায় বিষ মাখাইয়া যদি—

ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম; সে কেবল গলার মধ্যে চাপা কাশির মত শব্দ করিল।

রাত্রি দশটার মধ্যে আহার সমাধা করিয়া আমরা আবার বাহিরে গিয়া বসিলাম। এখনও দু'ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে হইবে। সীতারাম আহার সম্পন্ন করিয়া আড়ালে গেল; বোধ করি দু' একটা বিড়ি টানিবে। লণ্ঠনটা ঘরের কোণে কমানো আছে।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটার দিকে চলিয়াছে। মনের উত্তেজনা সত্ত্বেও ক্রমাগত হাই উঠিতেছে—

'ব্যোমকেশবাবু!'

চাপা গলার শব্দে চমকিয়া জড়তা কাটিয়া গেল। দেখিলাম, অদূরে ছায়ার মত একটি মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল, 'রমাপতি! এস।'

রমাপতিকে লইয়া আমরা ঘরের মধ্যে গেলাম। ব্যোমকেশ আলো বাড়াইয়া দিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, 'এবেলা কিছু খাওয়া হয়নি দেখছি।—সীতারাম!'

সীতারাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েকটা ডিম ভাজিয়া আনিয়া রমাপতির সম্মুখে রাখিল।

রমাপতি দ্বিরুক্তি না করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখ বসিয়া গিয়াছে; গায়ের হাফ-শার্ট স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, পায়ে জুতা নাই। খাইতে খাইতে বলিল, 'সব শুনেছেন তাহলে? কার কাছে শুনলেন?'

'তুলসীর কাছে। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'জঙ্গলে। তারপর দুর্গের পেছনে।'

'বেশী মারধর করেছে নাকি?'

রমাপতি পিঠের কামিজ তুলিয়া দেখাইল, দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া লাল দাগ ফুটিয়া আছে। ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হইয়া উঠিল।

'বংশীধর?'

রমাপতি ঘাড় নাড়িল।

'শহরে চলে গেলে না কেন?'

রমাপতি উত্তর দিল না, নীরবে খাইতে লাগিল।

'এখানে থেকে আর তোমার লাভ কি?'

রমাপতি অস্ফুট স্বরে বলিল, 'তুলসী—'

'তুলসীকে তুমি ভালবাসো?'

রমাপতি একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'ওকে সবাই যন্ত্রণা দেয়, ঘরে বন্ধ করে রাখে, কেউ ভালবাসে না। আমি না থাকলে ও মরে যাবে।'

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে নিজের বিছানা দেখাইয়া বলিল, 'শোও।'

রমাপতি ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিল। ব্যোমকেশ দীর্ঘকাল তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, 'রমাপতি, ঈশানবাবুকে কে খুন করেছে তুমি জানো?'

'না, কে খুন করেছে জানি না। তবে খুন করেছে।'

'হরিপ্রিয়াকে কে খুন করেছিল জানো?'

'না, দিদি বলবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু বলতে পারেনি।'

'বংশীধরের বৌ কেন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছিল জানো?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপতি বলিল, 'জানি না, কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। দিদি তাকে দেখতে পারত না, দিদির মনটা বড় কুচুটে ছিল। বোধ হয় মুখোশ পরে তাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিল—'

'মুখোশ?'

'দিদির একটা জাপানী মুখোশ ছিল। ঐ ঘটনার পরদিন মুখোশটা জঙ্গলের কিনারায় কুড়িয়ে পেলাম; বোধ হয় হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়েছিল। আমি সেটা এনে দিদিকে দেখালাম, দিদি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললে।'

'বংশীধর মুখোশের কথা জানে?'

'আমি কিছু বলিনি।'

'সাধুবাবাকে নিশ্চয় দেখেছ। কি মনে হয়?'

'আমার ভক্তি হয় না। কিন্তু কর্তা খুব মান্য করেন। বাড়ি থেকে সিধে যায়।'

'ঈশানবাবু কোনদিন সাধুবাবা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছিলেন?'

'না। দর্শন করতেও যাননি। উনি সাধু সন্ন্যাসীর ওপর চটা ছিলেন।'

ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'বারোটা বাজে। রমাপতি, তুমি ঘুমোও, আমরা একটু বেরুচ্ছি।'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রমাপতি বলিল, 'কোথায়?'

'বেশী দূর নয়, শীগ্‌গিরই ফিরব। এস অজিত।'

বড় টর্চটা লইয়া আমরা বাহির হইলাম।

রামকিশোরবাবুর বাড়ি নিষ্প্রদীপ। দেউড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলাম

বুলাকিলাল সগর্জনে নাক ডাকাইতেছে।

বৃক্ষ-বাটিকায় গাঢ় অন্ধকার, কেবল ভস্মাচ্ছাদিত ধুনি হইতে নিরুদ্ধ প্রভা বাহির হইতেছে। সাধুবাবা ধুনির পাশে শুইয়া আছেন; শয়নের ভঙ্গীটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

ব্যোমকেশ তাঁহার মুখের উপর তীব্র আলো ফেলিল, বাবাজী কিন্তু জাগিলেন না। ব্যোমকেশ তখন তাঁহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিল এবং সশব্দে নিশ্বাস টানিয়া বলিল, 'অ্যাঁ—!'

টর্চের আলো বাবাজীর সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া পায়ের উপর স্থির হইল। দেখা গেল গোড়ালির উপরিভাগে সাপের দাঁতের দুটি দাগ।

১১

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, এতদিনে রামবিনোদ সত্যি সত্যি দেহরক্ষা করলেন।'

'রামবিনোদ!'

'তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে। বুঝতে পারনি? ধন্য তুমি।'

ধুনিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া বহ্নিমান করিয়া তোলা হইয়াছে। বাবাজীর শব তাহার পাশে শক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আমরা দুইজন কিছুদূরে মুখোমুখি উপু হইয়া বসিয়া সিগারেট টানিতেছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে আছে, প্রথম রামকিশোরবাবুকে দেখে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল? আসলে তার কিছুক্ষণ আগে বাবাজীকে দেখেছিলাম। দুই ভায়ের চেহারায় সাদৃশ্য আছে; তখন ধরতে পারিনি। দ্বিতীয়বার রামকিশোরকে দেখে বুঝলাম।'

'কিন্তু রামবিনোদ যে প্লেগে মারা গিয়েছিল!'

'রামবিনোদের প্লেগ হয়েছিল, কিন্তু সে মরবার আগেই বাকি সকলে তাকে চড়ায় ফেলে পালিয়েছিল। চাঁদমোহনের কথা থেকে আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। তারপর রামবিনোদ বেঁচে গেল। এ যেন কতকটা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার মত।'

'এতদিন কোথায় ছিল?'

'তা জানি না। বোধ হয় প্রথমটা বৈরাগ্য এসেছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর দলে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপর হঠাৎ রামকিশোরের সন্ধান পেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ওকথা যাক, এখন মড়া আগ্‌লাবার ব্যবস্থা করা দরকার। অজিত, আমি এখানে আছি, তুমি টর্চ নিয়ে যাও, সীতারামকে ডেকে নিয়ে এস। আর যদি পারো, বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিয়ে তাকেও ডেকে আনো। ওরা দু'জনে মড়া পাহারা দিক।'

বলিলাম, 'তুমি একলা এখানে থাকবে? সেটি হচ্ছে না। থাকতে হয় দু'জনে থাকব, যেতে হয় দু'জনে যাব।'

'ভয় হচ্ছে আমাকেও সাপে ছোব্‌লাবে! এ তেমন সাপ নয় হে, জাগা মানুষকে ছোব্‌লায় না। যাহোক, বলছ যখন, চল দু'জনেই যাই।'

দেউড়িতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়াও, বুলাকিলালকে জাগানো যাক।'

অনেক ঠেলাঠেলির পর বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিল। তাহাকে বাবাজীর মৃত্যুসংবাদ দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সাধুবাবা ভাঙ খেয়েছিলেন?'

'জী, এক ঘটি খেয়েছিলেন।'

'আর কে কে ভাঙ খেয়েছিল?'

'আর বাড়ি থেকে চাকর এসে এক ঘটি নিয়ে গিয়েছিল।'

'বেশ, এখন যাও, বাবাজীকে পাহারা দাও গিয়ে। আমি সীতারামকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বুলাকিলাল ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঘুম ভাঙিলেও তাহার নেশার ঘোর কাটে নাই।

দুর্গে ফিরিয়া দেখিলাম সীতারাম জাগিয়া বসিয়া আছে। খবর শুনিয়া সে কেবল একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিল, তারপর নিঃশব্দে নামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে রমাপতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইলাম না, বাহিরে আসিয়া বসিলাম। রাত্রি সাড়ে বারোটা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আর ঘুমনো চলবে না। অন্তত একজনকে জেগে থাকতে হবে। অজিত, তুমি না হয় ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নাও, তারপর তোমাকে তুলে দিয়ে আমি ঘুমবো।'

উঠিতে মন সরিতেছিল না, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়াছিল। প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, বাবাজীকে মারলে কে?'

'ঈশানবাবুকে যে মেরেছে সে।'

'সে কে?'

'তুমিই বল না। আন্দাজ করতে পারো না?'

এই কথাটাই মাথায় ঘুরিতেছিল। আস্তে আস্তে বলিলাম, 'বাবাজী যদি রামবিনোদ হন তাহলে কে তাঁকে মারতে পারে? এক আছেন রামকিশোরবাবু—'

'তিনি ভাইকে খুন করবেন?'

'তিনি মুমূর্ষু ভাইকে ফেলে পালিয়েছিলেন। সেই ভাই ফিরে এসেছে, হয়তো সম্পত্তির বখরা দাবী করেছে—'

'বেশ, ধরা যাক রামকিশোর ভাইকে খুন করেছেন। কিন্তু ঈশানবাবুকে খুন করলেন কেন?'

'ঈশানবাবু রামবিনোদের প্রাণের বন্ধু ছিলেন, সন্ন্যাসীকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। হয়তো রামকিশোরকে শাসিয়েছিলেন, ভালয় ভালয় সম্পত্তির ভাগ না দিলে সব ফাঁস করে দেবেন। সন্ন্যাসীকে রামবিনোদ বলে সনাক্ত করতে পারে দু'জন—চাঁদমোহন আর ঈশানবাবু। চাঁদমোহন মালিকের মুঠোর মধ্যে, ঈশানবাবুকে সরাতে পারলে সব গোল মিটে যায়—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ আমার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, 'অজিত! ব্যাপার কি হে? তুমি যে ধারাবাহিক যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে আরম্ভ করেছ! তবে কি এতদিনে সত্যিই বোধোদয় হল! কিন্তু আর নয়, শুয়ে পড় গিয়ে। ঠিক তিনটের সময় তোমাকে তুলে দেব।'

আমি গমনোদ্যত হইলে সে খাটো গলায় কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'রমাপতি ঘুমোচ্ছে—না মটকা মেরে পড়ে আছে?—যাক, ক্ষতি নেই, আমি জেগে আছি।'

বেলা আটটা আন্দাজ পাণ্ডেজি আসিলেন। বাবাজীর মৃত্যুসংবাদ নীচেই পাইয়াছিলেন, বাকি খবরও পাইলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি লাস নিয়ে ফিরে যান। আবার আসবেন কিন্তু—আর শুনুন—'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ কথা বলিল। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বেশ, আমি দশটার মধ্যেই ফিরব। রমাপতিকে ঘর থেকে বেরুতে দেবেন না।'

তিনি চলিয়া গেলেন।

সাড়ে ন'টার সময় আমি আর ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম। বৈঠকখানায় তক্তপোশের উপর রামকিশোর বসিয়া ছিলেন, পাশে মণিলাল। বংশীধর ও মুরলীধর তক্তপোশের সামনে পদচারি করিতেছিল, আমাদের দেখিয়া নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। বোধ হয় পারিবারিক মন্ত্রণা সভা বসিয়াছিল, আমাদের আবির্ভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রামকিশোরের গাল বসিয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত। কিন্তু তিনি বাহিরে অবিচলিত আছেন। ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—বসুন।'

তক্তপোশের ধারে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। রামকিশোর একবার গলা ঝাড়া দিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুরকেও সাপে কামড়েছে। ক্রমে দেখছি এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল। বংশী আর মুরলী দু'একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, আমরা বাকী

ক'জন এখানেই থাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাপের উৎপাত যদি এভাবে বাড়তেই থাকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শীতকালে সাপের উৎপাত—আশ্চর্য!'

রামকিশোর বলিলেন, 'তার ওপর বাড়িতে কাল রাত্রে আর এক উৎপাত। এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত চোর ঢোকেনি—'

মণিলাল বলিল, 'এ মামুলী চোর নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি হয়েছিল?'

রামকিশোর বলিলেন, 'আমার শরীর খারাপ হয়ে অবধি মণিলাল রাত্রে আমার ঘরে শোয়। কাল রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময়—। মণিলাল, তুমিই বল। আমার যখন ঘুম ভাঙল চোর তখন পালিয়েছে।'

মণিলাল বলিল, 'আমার খুব সজাগ ঘুম। কাল গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল দরজার বাইরে পায়ের শব্দ। এ বাড়ির নিয়ম রাত্রে কেউ দোরে খিল দিয়ে শোয় না, এমন কি সদর দরজাও ভেজানো থাকে। আমার মনে হল আমাদের ঘরের দোর কেউ সন্তর্পণে ঠেলে খোলবার চেষ্টা করছে। আমার খাট দরজা থেকে দূরে; আমি নিঃশব্দে উঠলাম, পা টিপে টিপে দোরের কাছে গেলাম। ঘরে আলো থাকে না, অন্ধকারে দেখলাম দোরের কপাট আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। এই সময় আমি একটা বোকামি করে ফেললাম। আর একটু অপেক্ষা করলেই চোর ঘরে ঢুকতো, তখন তাকে ধরতে পারতাম। তা না করে আমি দরজা টেনে খুলতে গেলাম। চোর সতর্ক ছিল, সে দুড় দুড় করে পালাল।'

রামকিশোর বলিলেন, 'এই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাকে চোর মনে করছেন সে তুলসী নয় তো? তুলসীর শুনেছি রাত্রে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে।'

রামকিশোরের মুখের ভাব কড়া হইল, তিনি বলিলেন, 'না, তুলসী নয়। তাকে আমি কাল রাত্রে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম।'

ব্যোমকেশ মণিলালকে জিজ্ঞাসা করিল, 'চোরকে আপনি চিনতে পারেন নি?'

'না। কিন্তু—'

'আপনার বিশ্বাস চেনা লোক?'

'হ্যাঁ।'

রামকিশোর বলিলেন, 'লুকোছাপার দরকার নেই। আপনারা তো জানেন রমাপতিকে কাল আমি তাড়িয়ে দিয়েছি! মণিলালের বিশ্বাস সেই কোন মতলবে এসেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক ক'টার সময় এই ব্যাপার ঘটেছিল বলতে পারেন কি?'

রামকিশোর বলিলেন, 'ঠিক পৌনে বারোটার সময়। আমার বালিশের তলায় ঘড়ি থাকে, আমি দেখেছি।'

ব্যোমকেশ আমার পানে সঙ্কেতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল, আমি মুখ টিপিয়া রহিলাম। রমাপতি যে পৌনে বারোটার সময় ব্যোমকেশের খাটে শুইয়া ছিল তাহা বলিলাম না।

রামকিশোর বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'আজ সকালে আর একটা কথা জানা গেল। রমাপতি তার জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি, তার ঘরেই পড়ে ছিল। আজ সকালে ঘর তল্লাস করালাম। তার টিনের ভাঙা তোরঙ্গ থেকে এই জিনিসটা পাওয়া গেল।' পকেট হইতে একটি সোনার কাঁটা বাহির করিয়া তিনি ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

মেয়েরা যে-ধরনের লোহার দু'ভাঁজ কাঁটা দিয়া চুল বাঁধেন সেই ধরনের সোনার কাঁটা। আকারে একটু বড় ও স্থূল, দুই প্রান্ত ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ। সেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া ব্যোমকেশ সপ্রশ্নচক্ষে রামকিশোরের পানে চাহিল; তিনি বলিলেন, 'আমার বড় মেয়ে হরিপ্রিয়ার চুলের কাঁটা। তার মৃত্যুর পর হারিয়ে গিয়েছিল।'

কাঁটা ফেরৎ দিয়া ব্যোমকেশ পূর্ণদৃষ্টিতে রামকিশোরের পানে চাহিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু, এবার সোজাসুজি বোঝাপড়ার সময় হয়েছে।'

রামকিশোর যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, 'বোঝাপড়া!'

'হ্যাঁ। আপনার দাদা রামবিনোদবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

রামকিশোরের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তিনি কথা বলিবার জন্য মুখ খুলিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তারপর অতিকষ্টে নিজেকে আয়ত্ত করিতে করিতে অর্ধরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, 'আমার দাদা—! কার কথা বলছেন আপনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কার কথা বলছি তা আপনি জানেন। মিথ্যে অভিনয় করে লাভ নেই। সর্পাঘাত যে সত্যিকার সর্পাঘাত নয় তাও আমরা জানি। আপনার দাদাকে কাল রাত্রে খুন করা হয়েছে!'

মণিলাল বলিয়া উঠিল, 'খুন করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ। আপনি জানেন কি, সন্ন্যাসীঠাকুর হচ্ছেন, আপনার শ্বশুরের দাদা, রামবিনোদ সিংহ!'

রামকিশোর এতক্ষণে অনেকটা সামলাইয়াছেন, তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! আমার দাদা অনেকদিন আগে প্লেগে মারা গেছেন। এসব রোমান্টিক গল্প কোথা থেকে তৈরী করে আনলেন? সন্ন্যাসী আমার দাদা প্রমাণ করতে পারেন! সাক্ষী আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একজন সাক্ষী ছিলেন ঈশানবাবু, তাঁকেও খুন করা হয়েছে।'

রামকিশোর এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, ঊর্ধ্বস্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে! এসব পুলিসের কারসাজি। যান আপনারা আমার বাড়ি থেকে. এই দণ্ডে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যান। আমার এলাকায় পুলিসের গুপ্তচরের জায়গা নেই।'

এই সময় বাহিরে জানালায় মুরলীধরের ভয়ার্ত মুখ দেখা গেল—'বাবা! পুলিস বাড়ি ঘেরাও করেছে।' বলিয়াই সে অপসৃত হইল।

চমকিয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়া দেখি পায়ের বুট হইতে মাথার হেল্‌মেট পর্যন্ত পুলিস পোষাক-পরা পাণ্ডেজি ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহার পিছনে ব্যাগ হাতে ডাঃ ঘটক।

১২

পাণ্ডে বলিলেন, 'তল্লাসী পরোয়ানা আছে, আপনার বাড়ি খানাতল্লাস করব। ওয়ারেণ্ট দেখতে চান?'

রামকিশোর ভীত পাংশুমুখে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ভাঙা গলায় বলিলেন, 'এর মানে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আপনার এলাকায় দুটো খুন হয়েছে। পুলিসের বিশ্বাস অপরাধী এবং অপরাধের প্রমাণ এই বাড়িতেই আছে। আমরা সার্চ করে দেখতে চাই।'

রামকিশোর আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া 'বেশ, যা ইচ্ছে করুন'—বলিয়া তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন।

'ডাক্তার!'

ডাক্তার ঘটক প্রস্তুত ছিল, দুই মিনিটের মধ্যে রামকিশোরকে ইন্‌জেকশন দিল। তারপর নাড়ী টিপিয়া বলিল, 'ভয় নেই।'

ইতিমধ্যে আমি জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাহিরে পুলিস গিস্‌গিস্‌ করিতেছে; সিঁড়ির মুখে অনেকগুলা কনেস্টবল দাঁড়াইয়া যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর দুবে ঘরে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল, 'সকলে নিজের নিজের ঘরে আছে, বেরুতে মানা করে দিয়েছি।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেশ। দু'জন বে-সরকারী সাক্ষী চাই। অজিতবাবু, ব্যোমকেশবাবু, আপনারা সাক্ষী থাকুন। পুলিস কোনও বে-আইনি কাজ করে কি না আপনারা লক্ষ্য

রাখবেন।'

মণিলাল এতক্ষণ আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, 'আমিও কি নিজের ঘরে গিয়ে থাকব?'

পাণ্ডে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'মণিলালবাবু! না চলুন, আপনার ঘরটাই আগে দেখা যাক।'

'আসুন।'

পাণ্ডে, দুবে, ব্যোমকেশ ও আমি মণিলালের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি বেশ বড়, একপাশে খাট, তাছাড়া আলমারি দেরাজ প্রভৃতি আসবাব আছে।

মণিলাল বলিল, 'কি দেখবেন দেখুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশী কিছু দেখবার নেই। আপনার দুটো ফাউণ্টেন পেন আছে, সেই দুটো দেখলেই চলবে।'

মণিলালের মুখ হইতে ক্ষণকালের জন্য যেন একটা মুখোশ সরিয়া গেল। সেই যে ব্যোমকেশ বলিয়াছিল, গর্দভচর্মাবৃত সিংহ, মনে হইল সেই হিংস্র শ্বাপদটা নিরীহ চর্মাবরণ ছাড়িয়া বাহির হইল; একটা ভয়ঙ্কর মুখ পলকের জন্য দেখিতে পাইলাম। তারপর মণিলাল গিয়া দেরাজ খুলিল; দেরাজ হইতে পার্কারের কলমটি বাহির করিয়া দ্রুতহস্তে তাহার দু'দিকের ঢাক্‌নি খুলিয়া ফেলিল; কলমটাকে ছোরার মত মুঠিতে ধরিয়া ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। সে-চক্ষে যে কী ভীষণ হিংসা ও ক্রোধ ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। মণিলাল শ্বাদন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল, 'এই যে কলম। নেবে? এস, নেবে এস।'

আমরা জড়মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাণ্ডে কোমর হইতে রিভলবার বাহির করিলেন।

মণিলাল হায়েনার মত হাসিল। তারপর নিজের বামহাতের কব্জির উপর কলমের নিব বিঁধিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কালিভরা পিচ্‌কারিটা টিপিয়া ধরিল।

ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুকে বলিল, 'দুধ কলা খাইয়ে কালসাপ পুষেছিলেন। ভাগ্যে পুলিসের এই গুপ্তচরটা ছিল তাই বেঁচে গেলেন। কিন্তু এবার আমরা চললাম, আপনার আতিথ্যে আর আমাদের রুচি নেই। কেবল সাপের বিষের শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি।'

রামকিশোর বিহ্বল ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ দ্বার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আর একটা কথা বলে যাই। আপনার পূর্বপুরুষেরা অনেক সোনা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সে সোনা কোথায় আছে আমি জানি। কিন্তু যে-জিনিস আমার নয় তা আমি ছুঁতেও চাই না। আপনার পৈতৃক সম্পত্তি আপনি ভোগ করুন।—চলুন পাণ্ডেজি। এস অজিত।'

অপরাহ্ণে পাণ্ডেজির বাসায় আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া ব্যোমকেশ গল্প বলিতেছিল। শ্রোতা ছিলাম আমি, পাণ্ডেজি এবং রমাপতি।

'খুব সংক্ষেপে বলছি। যদি কিছু বাদ পড়ে যায়, প্রশ্ন কোরো।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'একটা কথা আগে বলে নিই। সেই যে সাদা গুঁড়ো পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন, কেমিস্টের রিপোর্ট এসেছে। এই দেখুন।'

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিল—'Sodium Tetra Borate—Borax, মানে সোহাগা? সোহাগা কোন্ কাজে লাগে? এক তো জানি, সোনায় সোহাগা। আর কোনও কাজে লাগে কি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ঠিক জানি না। সেকালে হয়তো ওষুধ-বিষুধ তৈরির কাজে লাগত।'

রিপোর্ট ফিরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। এবার শোনো। মণিলাল বাইরে বেশ ভাল মানুষটি ছিল, কিন্তু তার স্বভাব রাক্ষসের মত; যেমন নিষ্ঠুর তেমনি লোভী। বিয়ের পর সে মনে মনে ঠিক করল শ্বশুরের গোটা সম্পত্তিটাই গ্রাস করবে। শালাদের কাছ থেকে

সে সদ্ব্যবহার পায়নি, স্ত্রীকেও ভালবাসেনি। কেবল শ্বশুরকে নরম ব্যবহারে বশ করেছিল।

'মণিলালের প্রথম সুযোগ হল যখন একদল বেদে এসে ওখানে তাঁবু ফেলল। সে গোপনে তাদের কাছ থেকে সাপের বিষ সংগ্রহ করল।

'স্ত্রীকে সে প্রথমেই কেন খুন করল আপাতদৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। হয়তো দুর্বল মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে নিজের মতলব ব্যক্ত করে ফেলেছিল, কিম্বা হয়তো হরিপ্রিয়াই কলমে সাপের বিষ ভরার প্রক্রিয়া দেখে ফেলেছিল। মোট কথা প্রথমেই হরিপ্রিয়াকে সরানো দরকার হয়েছিল। কিন্তু তাতে একটা মস্ত অসুবিধে, শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে যায়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরকে এমন বশ করেছিল যে তার বিশ্বাস ছিল রামকিশোর তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন না। তুলসীর দিকে তার নজর ছিল।

'যাহোক, হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কোনও গণ্ডগোল হল না, তুলসীর সঙ্গে কথা পাকা হয়ে রইল। মণিলাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল, সম্পর্কটা একবার পাকা হয়ে গেলেই শালাগুলিকে একে একে সরাবে। দু'বছর কেটে গেল, তুলসী প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে এসেছে, এমন সময় এলেন ঈশানবাবু; তার কিছুদিন পরে এসে জুটলেন সাধুবাবা। এঁদের দু'জনের মধ্যে অবশ্য কোনও সংযোগ ছিল না; দু'জনে শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি যে বন্ধুর এত কাছে আছেন।

'রামকিশোরবাবু ভাইকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছেন এ গ্লানি তাঁর মনে ছিল। সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরে তাঁর হৃদয়যন্ত্র খারাপ হয়ে গেল, যায়-যায় অবস্থা। একটু সামলে উঠে তিনি ভাইকে বললেন, 'যা হবার হয়েছে, কিন্তু এখন সত্যি কথা প্রকাশ হলে আমার বড় কলঙ্ক হবে। তুমি কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে মঠ তৈরি করো থাকো, যত খরচ লাগে আমি দেব।' রামবিনোদ কিন্তু ভাইকে বাগে পেয়েছেন, তিনি নড়লেন না; গাছতলায় বসে ভাইকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন।

'এটা আমার অনুমান। কিন্তু রামকিশোর যদি কখনও সত্যি কথা বলেন, দেখবে অনুমান মিথ্যে নয়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরের অসুখে বড় মুশকিলে পড়ে গেল; শ্বশুর যদি হঠাৎ পটল তোলে তার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে, শালারা তদ্দণ্ডেই তাকে তাড়িয়ে দেবে। সে শ্বশুরকে মন্ত্রণা দিতে লাগল, বড় দুই ছেলেকে পৃথক করে দিতে। তাতে মণিলালের লাভ, রামকিশোর যদি হার্টফেল করে মরেও যান, নাবালকদের অভিভাবকরূপে অর্ধেক সম্পত্তি তার কব্জায় আসবে। তারপর তুলসীকে সে বিয়ে করবে, আর গদাধর সর্পাঘাতে মরবে।

'মণিলালকে রামকিশোর অগাধ বিশ্বাস করতেন, তাছাড়া তাঁর নিজেরও ভয় ছিল তাঁর মৃত্যুর পর বড় দুই ছেলে নাবালক ভাইবোনকে বঞ্চিত করবে। তিনি রাজী হলেন; উকিলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

'ওদিকে দুর্গে আর একটি ঘটনা ঘটছিল; ঈশানবাবু গুপ্তধনের সন্ধানে লেগেছিলেন। প্রথমে তিনি পাটিতে খোদাই করা ফারসী লেখাটা পেলেন। লেখাটা তিনি সযত্নে খাতায় টুকে রাখলেন এবং অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। তারপর নিজের শোবার ঘরে গজাল নাড়তে নাড়তে দেখলেন, একটা পাথর আলগা। বুঝতে বাকি রইল না যে ঐ পাথরের তলায় দুর্গের তোষাখানা আছে।

'কিন্তু পাথরটা জগদ্দল ভারী; ঈশানবাবু রুগ্ন বৃদ্ধ। পাথর সরিয়ে তোষাখানায় ঢুকবেন কি করে? ঈশানবাবুর মনে পাপ ছিল, অভাবে তাঁর স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। তিনি রামকিশোরকে খবর দিলেন না, একজন সহকারী খুঁজতে লাগলেন।

'দু'জন পূর্ণবয়স্ক লোক তাঁর কাছে নিত্য যাতায়াত করত, রমাপতি আর মণিলাল। ঈশানবাবু মণিলালকে বেছে নিলেন। কারণ মণিলাল ষণ্ডা বেশী। আর সে শালাদের ওপর খুশী নয় তাও ঈশানবাবু বুঝেছিলেন।

'বোধ হয় আধাআধি বখরা ঠিক হয়েছিল। মণিলাল কিন্তু মনে মনে ঠিক করলে সবটাই সে নেবে, শ্বশুরের জিনিস পরের হাতে যাবে কেন? নির্দিষ্ট রাত্রে দু'জনে পাথর সরিয়ে তোষাখানায় নামলেন।

'হাঁড়িকলসীগুলো তল্লাস করবার আগেই ঈশানবাবু মেঝের ওপর একটা মোহর কুড়িয়ে পেলেন। মণিলালের ধারণা হল হাঁড়িকলসীতে মোহর ভরা আছে। সে আর দেরি করল না, হাতের টর্চ দিয়ে ঈশানবাবুর ঘাড়ে মারল এক ঘা। ঈশানবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর তাঁর পায়ে কলমের খোঁচা দেওয়া শক্ত হল না।

'কিন্তু খুনীর মনে সর্বদাই একটা ত্বরা জেগে থাকে। মণিলাল ঈশানবাবুর দেহ ওপরে নিয়ে এল। এই সময় আমার মনে হয়, বাইরে থেকে কোনও ব্যাঘাত এসেছিল। মুরলীধর ঈশানবাবুকে তাড়াবার জন্যে ভয় দেখাচ্ছিলই, হয়তো সেই সময় ইট-পাটকেল ফেলেছিল। মণিলাল ভয় পেয়ে গুপ্তদ্বার বন্ধ করে দিল। হাঁড়িগুলো দেখা হল না; টর্চটাও তোষাখানায় রয়ে গেল।

'তোষাখানায় যে সোনাদানা কিছু নেই একথা বোধ হয় মণিলাল শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি। ঈশানবাবুর মৃত্যুর হাঙ্গামা জুড়োতে না জুড়োতে আমরা গিয়ে বসলাম; সে আর খোঁজ নিতে পারল না। কিন্তু তার ধৈর্যের অভাব ছিল না; সে অপেক্ষা করতে লাগল, আর শ্বশুরকে ভজাতে লাগল দুর্গটা যাতে তুলসীর ভাগে পড়ে।

'আমরা স্রেফ হাওয়া বদলাতে যাইনি, এ সন্দেহ তার মনে গোড়া থেকেই ধোঁয়াচ্ছিল, কিন্তু কিছু করবার ছিল না। তারপর কাল বিকেল থেকে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটল যে মণিলাল ভয় পেয়ে গেল। তুলসী তার কলম চুরি করে রমাপতিকে দিতে গেল। কলমে তখন বিষ ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু কলম সম্বন্ধে তার দুর্বলতা স্বাভাবিক। রমাপতিকে সে দেখতে পারত না—ভাবী পত্নীর প্রেমাস্পদকে কেই বা দেখতে পারে? এই ছুতো করে সে রমাপতিকে তাড়ালো। যাহোক, এ পর্যন্ত বিশেষ ক্ষতি হয়নি, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আর এক ব্যাপার ঘটল। আমরা যখন সাধুবাবার কাছে বসে তাঁর লম্বা লম্বা কথা শুনছি 'হাম ক্যা নহি জান্‌তা' ইত্যাদি—, সেই সময় মণিলাল বাবাজীর কাছে আসছিল; দূর থেকে তাঁর আস্ফালন শুনে ভাবল, বাবাজী নিশ্চয় তাকে ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে দুর্গে যেতে দেখেছিলেন, সেই কথা তিনি দুপুর রাত্রে আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবেন।

'মণিলাল দেখল, সর্বনাশ! তার খুনের সাক্ষী আছে। বাবাজী যে ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তা সে ভাবতে পারল না; ঠিক করল রাত বারোটার আগেই বাবাজীকে সাবাড় করবে।

'আমরা চলে আসবার পর বাবাজী এক ঘটি সিদ্ধি চড়ালেন। তারপর বোধ হয় মণিলাল গিয়ে আর এক ঘটি খাইয়ে এল। বাবাজী নির্ভয়ে খেলেন, কারণ মণিলালের ওপর তাঁর সন্দেহ নেই। তারপর তিনি নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন; এবং যথাসময়ে মণিলাল এসে তাঁকে মহাসুষুপ্তির দেশে পাঠিয়ে দিলে।'

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি কিছু জানতেন না, তবে আমাদের রাত দুপুরে ডেকেছিলেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেকেছিলেন তাঁর নিজের কাহিনী শোনাবার জন্যে, নিজের আসল পরিচয় দেবার জন্যে।'

'আর একটা কথা। কাল রাত্রে যে রামকিশোরবাবুর ঘরে চোর ঢুকেছিল সে চোরটা কে?'

'কাল্পনিক চোর। মণিলাল সাধুবাবাকে খুন করে ফিরে আসবার সময় ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিল, তাতে রামকিশোরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তাই চোরের আবির্ভাব। রামকিশোরবাবু আফিম খান, আফিম-খোরের ঘুম সহজে ভাঙে না, তাই মণিলাল নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল তখন মণিলাল চট্‌ করে একটা গল্প বানিয়ে ফেলল। তাতে রমাপতির ওপর একটা নতুন সন্দেহ জাগানো হল, নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরানো হল। রমাপতির তোরঙ্গতে হরিপ্রিয়ার সোনার কাঁটা লুকিয়ে রেখেও ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। যা শত্রু পরে পরে। যদি কোনও বিষয়ে কারুর ওপর সন্দেহ হয় রমাপতির ওপর সন্দেহ হবে।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

প্রশ্ন করিলাম, 'মণিলাল যে আসামী এটা বুঝলে কখন?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'অস্ত্রটা কী তাই প্রথমে ধরতে পারছিলাম না। তুলসী প্রথম যখন ফাউন্টেন পেনের উল্লেখ করল, তখন সন্দেহ হল। তারপর মণিলাল যখন ফাউন্টেন পেন আমার হাতে দিলে তখন এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মণিলাল নিজেই বললে বাড়িতে আর কারুর ফাউন্টেন পেন নেই। কেমন সহজ অস্ত্র দেখ? সর্বদা পকেটে বাহার দিয়ে বেড়াও, কেউ সন্দেহ করবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর পাণ্ডেজি বলিলেন, 'গুপ্তধনের রহস্যটা কিন্তু এখনও চাপাই আছে।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল।

বাড়ির সদরে একটা মোটর আসিয়া থামিল এবং হর্ন বাজাইল। জানালা দিয়া দেখিলাম, মোটর হইতে নামিলেন রামকিশোরবাবু ও ডাক্তার ঘটক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রামকিশোর জোড়হস্তে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। বুদ্ধির দোষে আমি সব ভুল বুঝেছিলাম। রমাপতি, তোকেই আমি সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছি বাবা। তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল।'

রমাপতি সলজ্জে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

১৩

রামকিশোরবাবুকে খাতির করিয়া বসানো হইল। পাণ্ডেজি বোধ করি চায়ের হুকুম দিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

ডাক্তার ঘটক হাসিয়া বলিল, 'আমার রুগীর পক্ষে বেশী উত্তেজনা কিন্তু ভাল নয়। উনি জোর করলেন বলেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি, নইলে ওঁর উচিত বিছানায় শুয়ে থাকা।'

রামকিশোর গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'আর উত্তেজনা! আজ সকাল থেকে আমার ওপর দিয়ে যা গেছে তাতেও যখন বেঁচে আছি তখন আর ভয় নেই ডাক্তার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যিই আর ভয় নেই। একে তো সব বিপদ কেটে গেছে, তার ওপর ডাক্তার পেয়েছেন। ডাক্তার ঘটক যে কত ভাল ডাক্তার তা আমি জানি কিনা। কিন্তু একটা কথা বলুন। সন্ন্যাসীকে দাদা বলতে কি আপনি এখনও রাজী নন?'

রামকিশোর লজ্জায় নতমুখ হইলেন।

'ব্যোমকেশবাবু, নিজের লজ্জাতে নিজেই মরে আছি, আপনি আর লজ্জা দেবেন না। দাদাকে হাতে পায়ে ধরেছিলাম, দাদা সংসারী হতে রাজী হননি। বলেছিলাম, আমি হরিদ্বারে মন্দির করে দিচ্ছি সেখানে সেবায়েৎ হয়ে রাজার হালে থাকুন। দাদা শুনলেন না। শুনলে হয়তো অপঘাত মৃত্যু হত না।' তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন।

পাণ্ডেজি ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে আমাদের পূর্বদৃষ্ট মোহরটি। সেটি রামকিশোরকে দিয়া বলিলেন, 'আপনার জিনিস আপনি রাখুন।'

রামকিশোর সাগ্রহে মোহরটি লইয়া দেখিলেন, কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, 'আমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি। তাঁরা সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমাদের কপালের দোষে এতদিন পাইনি। ব্যোমকেশবাবু, সত্যিই কি সন্ধান পেয়েছেন?'

'পেয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস। তবে চোখে দেখিনি।'

'তাহলে—তাহলে—!' রামকিশোরবাবু ঢোঁক গিলিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

'আপনার এলাকার মধ্যেই আছে। খুঁজে নিন না।'

'খোঁজবার কি ত্রুটি করেছি, ব্যোমকেশবাবু? কেল্লা কিনে অবধি তার আগাপাস্তলা তন্ন তন্ন করেছি। পাইনি; হতাশ হয়ে ভেবেছি সিপাহীরা লুটেপুটে নিয়ে গেছে। আপনি

যদি জানেন, বলুন। আমি আপনাকে বঞ্চিত করব না, আপনিও বখরা পাবেন। এঁদের সালিশ মানছি, পাণ্ডেজি আর ডাক্তার ঘটক যা ন্যায্য বিবেচনা করবেন তাই দেব। আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন, যদি অর্ধেক বখরাও চান—'

ব্যোমকেশ নীরস স্বরে বলিল, 'বখরা চাই না। কিন্তু দুটো শর্ত আছে।'

'শর্ত! কী শর্ত?'

'প্রথম শর্ত, রমাপতির সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, বিয়ের যৌতুক হিসেবে আপনার দুর্গ রমাপতিকে লেখাপড়া করে দিতে হবে।'

ব্যোমকেশ যে ভিতরে ভিতরে ঘটকালি করিতেছে তাহা সন্দেহ করি নাই। সকলে উচ্চকিত হইয়া উঠিলাম। রমাপতি লজ্জিত মুখে সরিয়া গেল।

রামকিশোর কয়েক মিনিট হেঁটমুখে চিন্তা করিয়া মুখ তুলিলেন। বলিলেন, 'তাই হবে। রমাপতিকে আমার অপছন্দ নয়। ওকে চিনি, ও ভাল ছেলে। অন্য কোথাও বিয়ে দিলে আবার হয়তো একটা ভূত-বাঁদর জুটবে। তার দরকার নেই।'

'আর দুর্গ?'

'দুর্গ লেখাপড়া করে দেব। আপনি চান পৈতৃক সোনাদানা তুলসী আর রমাপতি পাবে, এই তো? বেশ তাই হবে।'

'কথার নড়চড় হবে না?'

রামকিশোর একটু কড়া সুরে বলিলেন, 'আমি রাজা জানকীরামের সন্তান। কথার নড়চড় কখনও করিনি।'

'বেশ। আজ তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কাল সকালে আমরা যাব।'

পরদিন প্রভাতে আমরা আবার দুর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা চারজন—আমি, ব্যোমকেশ, পাণ্ডেজি ও সীতারাম। অন্য পক্ষ হইতে কেবল রামকিশোর ও রমাপতি। বুলাকিলালকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল দুর্গে যেন আর কেহ না আসে। সে দেউড়িতে পাহারা দিতেছিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনারা অনেক বছর ধরে খুঁজে খুঁজে যা পাননি ঈশানবাবু দু'হপ্তায় তা খুঁজে বার করেছিলেন। তার কারণ তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন, কোথায় খুঁজতে হয় জানতেন। প্রথমে তিনি পেলেন একটা শিলালিপি, তাতে লেখা ছিল,—'যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।' এ লিপি রাজারামের লেখা। কিন্তু মোহনলাল কে? ঈশানবাবু বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলে মনে হয় কোন গণ্ডগোলই হত না, তিনি চুরি করবার বৃথা চেষ্টা না করে সরাসরি রামকিশোরকে খবর দিতেন।

'তারপর ঈশানবাবু পেলেন গুপ্ত তোষাখানার সন্ধান; ভাবলেন সব সোনাদানা সেইখানেই আছে। আমরা জানি তোষাখানায় একটি গড়িয়ে পড়া মোহর ছাড়া আর কিছুই ছিল না; বাকি সব কিছু রাজারাম সরিয়ে ফেলেছিলেন। এইখানে বলে রাখি, সিপাহীরা তোষাখানা খুঁজে পায়নি; পেলে হাঁড়িকলসীগুলো আস্ত থাকত না।

'সে যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, মোহনলাল কে, যার জিম্মায় রাজারাম তামাম ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় মোহনলাল মানুষ হতে পারে না। দুর্গে সে সময় রাজারাম আর জয়রাম ছাড়া কেউ ছিল না; রাজারাম সকলকে বিদেয় করে দিয়েছিলেন। তবে কার জিম্মায় সোনাদানা গচ্ছিত রাখলেন? মোহনলাল কেমন জীব?

'আমিও প্রথমটা কিছু ধরতে পারছিলাম না। তারপর অজিত হঠাৎ একদিন পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করল—"আবার আবার সেই কামান গর্জন—গর্জিল মোহনলাল..."। কামান—মোহনলাল। সেকালে বড় বড় বীরের নামে কামানের নামকরণ হত। বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল মোহনলাল কে! কার জিম্মায় সোনাদানা আছে। ঐ যে মোহনলাল।' ব্যোমকেশ

অঙ্গুলি দিয়া ভূমিশয়ান কামানটি দেখাইল।

আমরা সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিলাম; রামকিশোর অস্থির হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ! তাহলে কামানের নীচে সোনা পোঁতা আছে!'

'কামানের নীচে নয়। সেকালে সকলেই মাটিতে সোনা পুঁতে রাখত; রাজারাম অমন কাঁচা কাজ করেননি। তিনি কামানের নলের মধ্যে সোনা ঢেলে দিয়ে কামানের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঐ যে দেখছেন কামানের মুখ থেকে শুকনো ঘাসের গোছা গলা বাড়িয়ে আছে, একশো বছর আগে সিপাহীরাও অমনি শুকনো ঘাস দেখেছিল; তারা ভাবতেও পারেনি যে ভাঙা অকর্মণ্য কামানের পেটের মধ্যে সোনা জমাট হয়ে আছে।'

রামকিশোর অধীর কণ্ঠে বলিলেন, 'তবে আর দেরি কেন? আসুন, মাটি খুঁড়ে মোহর বের করা যাক।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহর? মোহর কোথায়? মোহর আর নেই রামকিশোরবাবু। রাজারাম এমন বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন যে সিপাহীরা সন্ধান পেলেও সোনা তুলে নিয়ে যেতে পারত না।'

'মানে—মানে—কিছু বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাণ্ডেজি, তোষাখানায় একটা উনন আর হাপর দেখেছিলেন মনে আছে? সোহাগাও একটা হাঁড়িতে ছিল। বুঝতে পারলেন? রাজারাম তাঁর সমস্ত মোহর গলিয়ে ঐ কামানের মুখে ঢেলে দিয়েছিলেন। ওর ভেতরে আছে জমাট সোনার একটা থাম।'

'তাহলে—তাহলে—!'

'ওর মুখ থেকে মাটি খুঁড়ে সোনা দেখতে পাবেন হয়তো। কিন্তু বার করতে পারবেন না।'

'তবে উপায়?'

'উপায় পরে করবেন। কলকাতা থেকে অক্সি-অ্যাসিটিলিন্ আনিয়ে কামান কাটতে হবে; তিন ইঞ্চি পুরু লোহা ছেনি বাটালি দিয়ে কাটা যাবে না। আপাতত মাটি খুঁড়ে দেখা যেতে পারে আমার অনুমান সত্যি কিনা—সীতারাম!'

সীতারামের হাতে লোহার তুরপুন প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছিল। আদেশ পাইয়া সে ঘোড়সোয়ারের মত কামানের পিঠে চড়িয়া বসিল। আমরা নীচে কামানের মুখের কাছে সমবেত হইলাম। সীতারাম মহা উৎসাহে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

প্রায় এক ফুট কাটিবার পর সীতারাম বলিল, 'হুজুর, আর কাটা যাচ্ছে না। শক্ত লাগছে!'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'লাগাও তুরপুন!'

সীতারাম তখন কামানের মুখের মধ্যে তুরপুন ঢুকাইয়া পাক দিতে আরম্ভ করিল। দু'চারবার ঘুরাইবার পর চাক্‌লা চাক্‌লা সোনার ফালি ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমরা সকলে উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া কেবল অর্থহীন চীৎকার করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'ব্যস, সীতারাম, এবার বন্ধ কর। আমার অনুমান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রামকিশোরবাবু, দুর্গের মুখে মজবুত দরজা বসান, পাহারা বসান; যতদিন না সব সোনা বেরোয় ততদিন আপনারা সপরিবারে এসে এখানে বাস করুন। এত সোনা আলগা ফেলে রাখবেন না।'

সেদিন বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিয়াছে। আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। হঠাৎ 'তার' কেন? কাহার 'তার'?—সত্যবতী ভাল আছে তো!

তারের খাম ছিঁড়িতে ব্যোমকেশের হাত একটু কাঁপিয়া গেল। আমি অদূরে দাঁড়াইয়া অপলকচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

'তার' পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানা কেমন এক রকম হইয়া গেল; তারপর সে মুখ তুলিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, 'ওদিকেও সোনা।'

সোনা!

'হ্যাঁ—ছেলে হয়েছে।'

ছয় মাস পরে বৈশাখের গোড়ার দিকে কলকাতা শহরে গরম পড়ি-পড়ি করিতেছিল। একদিন সকালবেলা আমি এবং ব্যোমকেশ ভাগাভাগি করিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, সত্যবতী একবাটি দুধ ও ছেলে লইয়া মেঝেয় বসিয়াছে, দুধ খাওয়ানো উপলক্ষে মাতা-পুত্রে মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল, এমন সময় সদর দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ হইল। সত্যবতী ছেলে লইয়া পলাইবার উপক্রম করিল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখি রমাপতি ও তুলসী। রমাপতির হাতে একটি চৌকশ বাক্স, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, মুখে সলজ্জ হাসি।

তুলসীকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। এই কয় মাসে সে রীতিমত একটা যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে তাহাদের বিবাহ উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু যাইতে পারি নাই। ছয় মাস পরে তাহাদের দেখিলাম।

তুলসী ঘরে আসিয়াই একেবারে ঝড় বহাইয়া দিল। সত্যবতীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার কোল হইতে খোকাকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে ঘরময় ছুটাছুটি করিল; তারপর তাহাকে রমাপতির কোলে ফেলিয়া দিয়া সত্যবতীর আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গেল। তাহাদের কলকাকলি ও হাসির শব্দ পর্দা ভেদ করিয়া আমাদের কানে আসিতে লাগিল।

তুলসীর চরিত্র যেন পাথরের তলায় চাপা ছিল, এখন মুক্তি পাইয়াছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

ঘর ঠাণ্ডা হইলে ব্যোমকেশ রমাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাক্স কিসের? গ্রামোফোন নাকি?'

'না। আমরা আপনার জন্যে একটা জিনিস তৈরি করিয়ে এনেছি,'—বলিয়া রমাপতি বাক্স খুলিয়া যে জিনিসটি বাহির করিল আমরা তাহার পানে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। আগাগোড়া সোনার গড়া দুর্গের একটি মডেল। ওজন প্রায় দুই সের, অপূর্ব কারুকার্য। আসল দুর্গের সহিত কোথাও এক তিল তফাত নাই; এমন কি কামানটি পর্যন্ত যথাস্থানে রহিয়াছে।

আমরা চমৎকৃত স্বরে বলিলাম, 'বাঃ!'

তারপর খাওয়া-দাওয়া গল্পগাছা রঙ্গতামাসায় বেলা কাটিয়া গেল। রামকিশোর-বাবুদের খবর জানা গেল, কর্তার শরীর ভালই যাইতেছে, বংশীধর নিজের জমিদারীতে বাড়ি তৈয়ারী করিয়াছে; মুরলীধর শহরে বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছে; গদাধর তুলসী ও রমাপতিকে লইয়া কর্তা শৈলগৃহেই আছেন; চাঁদমোহন আবার জমিদারী দেখাশুনা করিতেছেন। দুর্গটিকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করানো হইতেছে। তুলসী ও রমাপতি সেখানে বাস করিবে।

অপরাহ্ণে তাহারা বিদায় লইল। বিদায়কালে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুলসী, তোমার মাস্টার কেমন?'

মাস্টারের দিকে কপট-কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া তুলসী বলিল, 'বিচ্ছিরি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। একদিন আমার কোলে বসে মাস্টারের জন্যে কে'দেছিলে মনে আছে?'

এবার তুলসীর লজ্জা হইল। মুখে আঁচল চাপা দিয়া সে বলিল, 'ধেৎ!'